মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজিঃ নং- ১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-০২

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

মার্চ ২০১৪ইং, জুমাদাল উলা ১৪৩৫হিঃ, ফাল্গুন ১৪২০বাং

جمادى الاولى ١٤٣٥ مارس ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়ঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল :monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :............................. ৪

পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৫

শরীয়তের দৃষ্টিতে জবরদখল ও তার কতিপয় বিধান ৬
মুফতী শাহেদ রহমানী

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৮

মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত : ইসলামী বিয়ে-১৩... ৯

“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ: বিভ্রান্তি ও নিরসন-৭

ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করার শরয়ী বিধান ১৬
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক

দেওবন্দিয়ত শতাব্দীর একটি ‘তাজদীদী’ চিন্তা-চেতনার নাম ২১
মুফতী আবুল কাসেম নূমানী

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২.......... ২৪
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা ২৮
মাওলানা মুহাম্মদ হাসান

এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব ৩৩
মাওলানা মুহাম্মদ হারুন

আলেম সমাজের প্রতি কেন এত বিষোদগার? ৩৬
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة

শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরতুল আল্লাম
আলহাজ শাহ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) এর জীবনী গ্রন্থে প্রকাশিত
হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দা.বা.) এর অভিব্যক্তি

[সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দ্বিতীয় মহাপরিচালক শায়খুল আরব ওয়াল আজম আলহাজ মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) এর জীবন-কর্ম-অবদান শীর্ষক জীবনীগ্রন্থ। বহুল প্রতিক্ষীত এ গ্রন্থ প্রকাশকালে হযরত হাজী সাহেব হুজুরের সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের একান্ত সহকর্মী হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) যে অভিব্যক্তি জানিয়েছেন তা হুবহু তুলে ধরা হলো। আরশাদ রহমানী]

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। কওমী মাদরাসা অঙ্গনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা শিক্ষা-দীক্ষার সুস্থ-সুন্দর নীতিমালা প্রণয়নের অগ্রপথিক এ জামিয়া। এটি মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, কওমী অঙ্গনের এ জামিয়াই সর্বপ্রথম আপন চৌহদ্দির বাইরে সমাজের প্রতিটি স্তরে বহুবিদ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সরব অংশগ্রহণ করে। মানবতার কল্যাণে যার ব্যাপক খিদমাত সর্বমহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। এই জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক কুতবে জামান হযরত মাওলানা মুফতী আজীজুল হক্ব (রহ.)। তাঁর ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। জামিয়ার সালানা জলসা। অর্ধ লক্ষাধিক ভক্ত-অনুরক্ত ও মুরিদীনদের উপস্থিতি। মঞ্চে তাশরীফ আনলেন সকলের প্রাণপ্রিয় মুরব্বি হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)। ঘোষণা দিলেন, 'আজ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস (প্রকাশ হাজি সাহেব)-কে আমি এই জামিয়ার মুহতামিম পদে নিয়োগ করলাম।' পুরো জলসায় পিনপতন নীরবতা। সকলের চেহারায় ফুটে ওঠা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বুঝতে পেরে হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) আবারও বলতে শুরু করলেন, 'আমি মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুসকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের পূর্বে বহুভাবে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেছি। বরাবরই তাঁকে পুরোপুরি মাদরাসামুখী পেয়েছি, পরিবারমুখী নয়। তাই তাঁকে এই গুরুদায়িত্ব প্রদান করলাম।'

যে বছর হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয় সে বছরই জামিয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় জামিয়ার। নবনিযুক্ত মুহতামিম হিসেবে হযরত হাজী সাহেব (রহ.) খোদা প্রদত্ত মেধা, প্রজ্ঞা দ্বারা মাদরাসা পুনর্গঠনের কাজ চালিয়ে যান। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) স্বচক্ষে তা অবলোকন করে নিজের সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত হন। এর কিছুকাল পরে পবিত্র রমজান মাসে হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) ইন্তিকাল করেন। জানাযা শেষে চট্টগ্রামের বেশ কজন শীর্ষ উলামায়ে কেরাম চট্টগ্রাম শহরের একটি মাদরাসায় মিলিত হন। সেখানে জামিয়া পটিয়ার শূরার সদস্য ছিলেন ক'জন। তাঁরা আলোচনা করেন জামিয়া পটিয়ার মতো এত বিশাল জাহাজ হাজী সাহেবের পক্ষে পরিচালনা করা কঠিন। তাঁরা মুহতামিম হিসেবে হযরত খতীবে আজম (রহ.)-এর নামও পর্যালোচনা করেন। ওই বছরই শাওয়াল মাসের তিন বা চার তারিখে হযরত হাজী সাহেব (রহ.) শূরার অধিবেশন আহ্বান করেন। পরদিনই হযরত হাজী সাহেব হুজুর (রহ.)-এর যাত্রা ছিল পবিত্র মক্কা অভিমুখে। হজ্বব্রত পালনার্থে। শূরার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-এর বিপক্ষে অন্য কারো নাম প্রস্তাব করার সাহসও করেনি কেউ বিভিন্ন কারণে। কারণগুলোর উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

হযরত হাজী সাহেব (রহ.) জামিয়া গঠনের প্রতি আত্মনিয়োগ করেন। একপর্যায়ে গোটা বিশ্বের কাছে একটি মানসম্মত দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে জামিয়া পটিয়ার অবস্থান তুলে ধরতে সক্ষম হন। গড়ে তোলেন এই জামিয়াকে শিক্ষা-দীক্ষার সুষ্ঠু-সুন্দর পরিবেশসংবলিত একটি নজিরবিহীন প্রতিষ্ঠানরূপে। ফলে এটি অন্য সকল কওমী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য হয়ে ওঠে অনুসরণীয়-অনুকরণীয়। যার অনুসরণে এ দেশের বহু ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের হিসাবব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, হোস্টেলব্যবস্থাসহ গোটা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দরভাবে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হয়।

জামিয়া পটিয়ার এই গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পালনের পাশাপাশি মানবকল্যাণে অসংখ্য খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন হযরত হাজী সাহেব (রহ.)। বহুবিদ গুণাবলির অধিকারী এই মহান ব্যক্তিত্বের যে গুণটি সমসাময়িক সকল মুরব্বির মধ্যে তাঁকে অনন্তকাল পর্যন্ত স্বমূর্তিতে সগৌরবে উজ্জ্বল করে রাখবে তাহলো 'ইত্তিহাদ বাইনাল মুসলিমীন'র ক্ষেত্রে তাঁর অবদান। মাদরাসা-মসজিদ নিয়ে কোনো বিভেদ হোক–চাই কোনো রাজনৈতিক বিভেদ, সাংগঠনিক বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। যে ধরনের বিভেদ-বিদ্বেষ দেখা দিক না কেন সমাজে, হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-এর তাওয়াজ্জুহের হিমশীতল পরশে নিমিষেই তা শেষ হয়ে যেত। প্রতিষ্ঠা পেত সেখানে সৌহার্দতা, ভ্রাতৃত্ব, ইত্তিহাদ ও ইত্তিফাক। এমনকি উম্মুল মাদারিস হাটহাজারী মাদরাসায় ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ফাসাদ দমনে হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ শক্ত সাহসী ভূমিকাই ছিল যুগান্তকারী। সেদিন তাঁর সাহসী ভূমিকায়

রক্ষা হয়েছিল আকাবিরদের এই আমানত। আমি মনে করি, এই গুণটি তাঁর সবচেয়ে বড় বুজুর্গি এবং কারামত।

আমি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর তাঁর সাথে সফরেও ছিলাম হাজরেও। নির্জনেও ছিলাম তাঁর সাথে কোলাহলেও। মখলুকের সাথে যখন থাকতেন তিনি তখনও সাথে ছিলাম, যখন খালেকও মালেকের সাথে নিয়াজও নয়াজ করতেন তখনও ছিলাম পাশে। তিনি আমার উস্তাদও ছিলেন না, পীরও নন। তবুও তাঁকে আমি নিজের পীর ও উস্তাদের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ও অগাধ আস্থার সাথে মেনে চলেছি। সুদীর্ঘ চলার পথে তাঁর জীবনের পরতে পরতে যে জিনিসটি আমি দেখেছি, তাহলো নবীয়ে করীম (সা.)-এর ওই পাঁচটি আদর্শ তাঁর মধ্যে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, যা উম্মাহাতুল মুমিনীন সায়্যিদা খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর বর্ণনা হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীসে এভাবে এসেছে–

"لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِى." فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

নবী করীম (সা.) সর্বপ্রথম ওহি প্রাপ্তির পর গারে হেরা থেকে উম্মাহাতুল মুমিনীন সায়্যিদা খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'আমি নিজের ওপর আশঙ্কাবোধ করছি। উত্তরে উম্মাহাতুল মুমিনীন সায়্যিদা খাদীজাতুল কুবরা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম কখনও না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমনদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

উম্মাহাতুল মুমিনীন সায়্যিদা খাদীজাতুল কুবরা (রা.) রাসূলে কারীম (সা.)-এর পাঁচটি আদর্শের কথা এখানে উল্লেখ করে বলেছেন, যেহেতু আপনি এই আদর্শগুলো ধারণ করেন তাই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনও অপমাণিত করবেন না। আদর্শগুলো হলো ১. আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা। ২. দুর্বলের দায়িত্ব বহন করা। ৩. নিঃস্বকে সাহায্য করা। ৪. দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করা। ৫. মেহমানের মেহমানদারী করা।

হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-এর জীবনে এই পাঁচটি আদর্শ আমি পুরো মাত্রায় অবলোকন করেছি। তাঁর এই বিশাল জীবনীগ্রন্থে হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-এর উল্লিখিত পাঁচ আদর্শের ভিত্তিতে অতিবাহিত জীবনের সামান্যতম চিত্রও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তাঁকে কোনো আত্মীয়স্বজনের সাথে অসদাচরণ করতে কখনও দেখিনি। সব সময় সর্বাবস্থায় আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে দেখেছি।

দুর্বলের দায়িত্ব বহনের ক্ষুদ্র একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি, যাতে সহজে অনুমান করা যায় এই আদর্শটি তাঁর মধ্যে কী মাত্রায় ছিল। মক্কা শরীফে আমরা একসাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে দেখা আমার এলাকার একটি সরকারি মাদরাসার প্রিন্সিপালের সাথে। তিনি কতগুলো কিতাব কিনেছেন এবং সেগুলো বহন করে বাসা পর্যন্ত নিতে পারছেন না। হযরত হাজী সাহেব (রহ.) বললেন, চলো, এগুলো আমরা নিয়ে বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসি। এ কথা বলে তিনি কিতাবের একটি কার্টন মাথায় তুলে নিলেন। আমরাও নিলাম। পৌঁছে দিলাম প্রিন্সিপালের বাসায়। এই ছিল তাঁর আদর্শ।

নিঃস্ব এবং দুর্দশাগ্রস্তের সাহায্যের ক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন তা কয়েক ডজন এনজিও মিলেও করতে পারবে বলে আমি মনে করি না।

মেহমানদারী। এটি তো তাঁর মধ্যে এতমাত্রায় ছিল যে, রাত যত গভীরই হোক না কেন, কোনো মেহমান এলে তিনি নিজে রান্নাঘরে গিয়ে মেহমানের জন্য আহার বিহারের ব্যবস্থা করতেন নিঃসঙ্কোচে। তিনি এ কথা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করতেন, মেহমানের যথাসাধ্য সম্মান ও খিদমত করা ঈমানের লক্ষণ। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত–

عن ابى هريرةؓ ان النبى قال :من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ـ متفق عليه

এই আদর্শগুলোর ওপর গোটা জীবন তিনি অবিচল ছিলেন বলে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বত্র। অপমাণিত হননি জীবনে কখনও। এই আদর্শের প্রতীক ছিলেন বলেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন শায়খুল আরব ওয়াল আজম। এই আদর্শগুলো তাঁর রেখে যাওয়া স্মৃতি এবং তাঁর জীবন থেকে সকলের জন্য শিক্ষণীয়।

আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তাঁর মতো এমন মুরব্বি এ দেশে পূর্বেও দেখিনি, বর্তমানও না, ভবিষ্যৎ আল্লাহই জ্ঞাত।

সম্প্রতি অনেক জীবনী লেখক মনীষীদের জীবনধারা বর্ণনায় অতিরঞ্জিত করে থাকেন, যা মোটেও ঠিক নয়। আবার এটিও ঠিক নয় যে, কোনো মনীষীর জীবনধারা পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা। তবে এটি কঠিন বাস্তবতা যে, পৃথিবীতে এমন কিছু মহামনীষীর আগমন ঘটে, যাদের জীবনী পরিপূর্ণভাবে বর্ণনায়ন কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি মনে করি, হযরত হাজী সাহেব (রহ.)ও এই ধরনের মহামনীষীদের একজন। এ কারণেই হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-এর জীবনী লেখকেরা হয়তো তাঁর জীবনী কিভাবে লিখবেন, কোথা থেকে শুরু করবেন–সেই ভাবনায় পার করেছেন দীর্ঘ দুই যুগ। দেরিতে হলেও বহুল প্রতীক্ষিত এই জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ তাঁর শত সহস্র ভক্ত-মুরিদ-শাগরিদদের পক্ষে দায়মুক্তি নিশ্চয়ই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম বদলা দান করুন আমীন।

(মুফতী আব্দুর রহমান)
০৭/০২/২০১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হতো, অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ করো; অনন্তর যখন তুমি সংকল্প করেছ, তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে ভালোবাসেন। (আলে ইমরান ১৫৯)

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর ও মুসলমানদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন, তা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মান্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বহু দূরে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্তরকে কোমল করে দিয়েছেন। তাঁর অনুকম্পা না হলে তাঁর নবীর হৃদয় এত কোমল হতো না।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন যে, صلة ما শব্দটি যাকে আরববাসী কখনও বা معرفة এর সঙ্গে মিলিয়ে থাকে। যেমন فبما نقضهم এর মধ্যে। আবার কখনও نكرة এর সঙ্গেও মিলিয়ে থাকে। যেমন عما قليل এর মধ্যে। এখানে ওই রূপই হয়েছে। অর্থাৎ হে নবী! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি আল্লাহর করুণার ফলেই কোমল অন্তর বিশিষ্ট হয়েছেন। হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন, এটাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চরিত্র, যার ওপর তিনি প্রেরিত হয়েছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল এসেছেন, যাঁর ওপর তোমাদের কষ্ট কঠিন ঠেকে, যিনি মুমিনদের ওপর স্নেহশীল, দয়ালু। মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু উমামা বাহেলী (রহ.)-এর হাত ধরে বলেন, হে আবু উমামা! কতগুলো মুমিন এমন আছে, যাদের জন্য আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়।

غليظ القلب শব্দের অর্থ হচ্ছে, কর্কশ ভাষা। কেননা এর পরে فظا শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ কঠিন হৃদয়। ইরশাদ হচ্ছে, যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয় বিশিষ্ট হতেন তবে মানুষ আপনার চতুষ্পার্শ্ব হতে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং আপনাকে পরিত্যাগ করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে আপনার প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করেছেন। আর এ জন্য তাদের দিক হতে আপনাকেও প্রেম ও নম্রতা দান করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলি দেখেছি যে, তিনি কর্কশভাষী, কঠিন হৃদয়, বাজারে গোলমালকারী এবং ন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণকারী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মার্জনাকারী ও ক্ষমাকারী। জামেউত তিরমিযীর মধ্যে একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মানুষকে অভিবাদন জানাতে, তাদের মঙ্গল কামনা করতে, তাদের অপরাধ এড়িয়ে চলতে আমাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ওই রূপই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেরূপভাবে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতেও তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, হে নবী! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও আল্লাহ পাকের নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকল কার্যে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করুন।

এ কারণে সাহাবীগণকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সকল কার্যে তাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং ওটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি তাদের নিকট পরামর্শ নেন। তখনই তাঁর সহচরবৃন্দ বলেছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড়করত পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, তবুও সে নির্দেশ পালনে আমরা মোটেই কুণ্ঠিত হব না। আর যদি আপনি আমাদেরকে বারকুল গামাদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন তাহলেও আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সাথে গমন করব। আমরা হযরত মূসা (আ.)-এর সহচরদের ন্যায় 'তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে থাকছি' এরূপ কথা কখনও মুখে আনব না। বরং আমরা আপনার ডানে-বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করব। এরূপ অবতরণস্থল কোথায় হবে, তিনি তারও পরামর্শ গ্রহণ করেন। হযরত মুনযির ইবনে আমর (রা.) পরামর্শ দেন যে, আগে বেড়ে তাদের সম্মুখে হতে হবে। অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধেও তিনি পরামর্শ নেন যে, মদীনার ভেতরে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে, না বাইরে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হবে? অধিকাংশ লোক মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই মত প্রকাশ করেন। অতএব তিনি তা-ই করেন। এমনিভাবে যেকোনো কাজে নবী করীম (সা.) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন।

এই আয়াতে ইসলামী নেতৃত্বের সফল গুণাবলি এবং কাজের পদ্ধতির কথা স্পষ্ট হয়েছে। একটি হলো, ইসলামের অভিভাকদের কোমল হৃদয়, ভালো আচরণ এবং মার্জিত ভাষার হতে হবে। সুতরাং সব ক্ষেত্রে জ্বালাময়ী বক্তব্য-বিবৃতিকেই ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলি মনে করা ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

আর কাজ হলো, যেকোনো কাজ পরামর্শের মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়া। তবে ইসলামী শরীয়তে পরামর্শ কার কাছ থেকে করা হবে, কিভাবে করা হবে–এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুর মূল্য :

عن عبد الله بن مسعودؓ قال قال رسول الله ﷺ مامن عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وان كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه الا حرمه الله على النار (رواه ابن ماجة

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহর ভয়ে যে মুমিন বান্দার চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয়, সেটা যদি মাছির মাথার সমানও হয় (অর্থাৎ এক ফোঁটা পরিমাণও হয়) তারপর সেই অশ্রু গড়িয়ে তার চেহারায় পৌঁছে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ চেহারাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম এই যে, যে চেহারা আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রু দ্বারা কখনো সিক্ত হয়েছে সেই চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা হবে এবং জাহান্নামের আঁচ এতে লাগতে পারবে না।

যে সকল হাদীসে কোনো বিশেষ আমলের ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, সেগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য সাধারণত এই হয়ে থাকে যে, এ নেক আমলের নিজস্ব প্রভাব ও দাবি এটাই এবং আল্লাহ তা'আলা এর আমলকারীকে জাহান্নামের আগুন থেকে সম্পূর্ণ হেফাজতে রাখবেন। কিন্তু শর্ত হলো, তার পক্ষ থেকে এমন কোনো বড় গোনাহ সংঘটিত না হওয়া, যার কারণে এর বিপরীত দাবি অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দাবি সৃষ্টি হয়ে যায় অথবা এমন কোনো গোনাহ হয়ে থাকলেও সে যদি তওবা করে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিয়ে থাকেন। এ কথা কেউ যেন মনে না করে যে, এটা মনগড়া ব্যাখ্যা। কেননা বাস্তবতাকে সামনে রেখেই বলতে হয় যে, আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা এবং বাকরীতিতেও এ ধরনের সুসংবাদ ও প্রতিশ্রুতির বেলায় এ শর্ত সর্বদাই আরোপিত থাকে।

আল্লাহর ভয়ে শরীরে শিহরণ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য :

عن العباس رفعه اذا قشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن الشجر البالية ورقها (رواه البزار)

হযরত আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে যখন কোনো বান্দার লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে তখন তার গোনাহ এভাবে ঝরে পড়ে, যেভাবে শুকনো গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে। (মুসনাদে বাযযার)

ব্যাখ্যা : ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক এগুলো মানুষের অন্তরের অবস্থার নাম। কিন্তু মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তার অন্তরের অবস্থার প্রকাশ দেহের ওপরও হয়ে যায়। যেমন যখন মানুষের অন্তরে খুশি ও আনন্দের অবস্থা থাকে, তখন চেহারার ওপরও আনন্দচিত্ততা ফুটে ওঠে এবং অনেক সময় সে এভাবের কারণে হাসে। অনুরূপভাবে যখন মানুষের অন্তরে দুঃখ ও বেদনা থাকে তখন এটাও তার চেহারা থেকে প্রকাশ পায় এবং কখনো কখনো সে এর প্রভাবে কাঁদে। এমনকি তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

এমনিভাবে মানুষের অন্তরে যখন ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন তার দেহে এর প্রভাব লক্ষ করা যায় যে, তার সারা দেহের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসটিতে ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ভয়ে যাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। আর হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণিত এ হাদীসে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ভয়ে যার শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে তার শরীর থেকে তার গোনাহ এভাবে ঝরে পড়ে, যেভাবে শীতের শেষ ভাগে শুকনো গাছের পাতা ঝরে পড়ে।

যার অন্তরে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে :

عن انسؓ عن النبى ﷺ قال يقول الله جل ذكره اخرجوا من الناس ذكرنى يوما او خافنى فى مقام (رواه الترمذى والبيهقى في كتاب البعث والنشور)

হযরত আনাস (রা.) সূত্রে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা (জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে) নির্দেশ দেবেন, আমার যে বান্দা কোনো দিন আমাকে স্মরণ করেছে অথবা কোনো স্থানে আমাকে ভয় করেছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। (তিরমিযী, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : এ কথাটি কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি কুফর অথবা শিরকের অবস্থায় এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, সে চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে এবং তার কোনো আমলই তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনতে পারবে না। তাই হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এ হাদীসটির মর্ম এই হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিয়েছে যে, সে কাফের অথবা মুশরিক ছিল না, বরং ঈমান তার মধ্যে ছিল, কিন্তু তার গোনাহ ছিল অনেক এবং নেক আমলের সঞ্চয় তার সাথে ছিল না। তবে সে কখনো আল্লাহর কথা স্মরণ করেছিল অথবা কোনো ক্ষেত্রে অন্তরে আল্লাহর ভয়ের কিছুটা ভাব জাগ্রত হয়েছিল। কেয়ামতের দিন তার পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য তাকে জাহান্নামে তো নিক্ষেপ করা হবে; কিন্তু কোনো দিন আল্লাহকে স্মরণ করার কারণে এবং আল্লাহকে ভয় করার বরকতে সে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে।

দরসে ফিক্বহ

শরীয়তের দৃষ্টিতে জবরদখল ও তার কতিপয় বিধান

মুফতী শাহেদ রহমানী

কারো সম্পদ জোরপূর্বকভাবে ভোগ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় 'গসব'। বাংলায় যাকে জবরদখল বলা হয়। ছিনতাই, ডাকাতি, চুরি ইত্যাদিও গসবের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন-হাদীসের আলোকে অন্যের মালিকানাধীন কোনো জিনিস অন্যায়ভাবে জবরদখল করা মারাত্মক গোনাহের কাজ এবং এটি অনৈতিক অপরাধও বটে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করবে না। তবে যদি ব্যবসার ভিত্তিতে পারস্পরিক সন্তুষ্টচিত্তে হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। (সূরা নিসা ২৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع ارض

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও জবর দখল করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত তবক জমিনকে বেড়ি বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দেবেন।

জবরদখলকৃত সম্পদের বিধান :

কোনো ব্যক্তি অপরের কোনো সম্পদ জবরদখল করলে শরীয়তের বিধান হলো, মালিককে তা ফিরিয়ে দেওয়া। যদি তা ব্যয় করে ফেলে তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে। অর্থাৎ জবরদখলকৃত বস্তুটি যদি পরিমাপযোগ্য হয় তার অনুরূপ কোনো বস্তু থাকে তবে তা দিয়েই তার জরিমানা দেবে। আর যদি তার অনুরূপ বস্তু বাজারে পাওয়া না যায়, তবে যেদিন সর্বশেষ বাজারে পাওয়া গেছে, সেদিন উক্ত পণ্যের যে মূল্য ছিল, তা দিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে জবরদখলকৃত বস্তুটি যদি মূল্যমান বিশিষ্ট হয়, তবে জবরদখল করার দিনের দাম দিয়ে দেবে। যেমনটি উল্লেখ করেছেন আল্লামা শামী (রহ.)

وقال العلامة ابن عابدينؒ (قوله ورجحهما) اى قول ابى يوسفؒ وقول محمدؒ وكان الاولى ان يقول ايضا اى كما رجح قول الامام ضمنا لمشى المتون عليه وصريحا۔

قال القهستانى: وهو الاصح كما فى الخزانة وهو الصحيح كما فى التحفة، وعند ابى يوسفؒ يوم الغصب، وهو اعدل الاقوال كما قال المصنف وهو المختار على ماقال صاحب النهاية وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما فى ذخيرة الفتاوى وبه افتى كثير من المشائخ۔

ভুলবশত অন্যের সম্পদ ভোগ করার বিধান :

আইনি জটিলতা বা অন্য কোনো কারণে ভুলবশত অন্যের সম্পদ ভোগ করে থাকলে প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথেই ওই সম্পদ মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। এবং বিগত দিনে সে সম্পদ দ্বারা যে পরিমাণ লাভবান হয়েছে, তাও ফেরত দিতে হবে। যেমন–অন্যের কোনো জমির মাপ ভুলের কারণে কারো কাছে এসে থাকলে যখনই এটি স্পষ্ট হবে যে, এ জমিটি তার নয়, তখনই তা তার আসল মালিককে ফেরত দিতে হবে। সাথে সাথে উক্ত জমি থেকে বিগত বছরগুলোই যে পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হয়েছে, সেখান থেকে বীজের দাম ও চাষাবাদের খরচাপাতি বাদ দিয়ে যা থাকবে তার সঠিক অঙ্ক বের করা সম্ভব হলে, সেটা আর সম্ভব না হলে তার আনুমানিক অঙ্ক বের করে মূল মালিককে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। (ইমদাদুল আহকাম)

অন্যের জন্তু বিনা অনুমতিতে জবাই করে খাওয়ার বিধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যের পশু অনুমতি ছাড়া জবাই করা গসব তথা জবরদখলের শামিল। তাই মালিকের জন্য এখন দুটি পন্থার কোনো একটি গ্রহণের এখতেয়ার থাকবে।

১. জবাইকৃত প্রাণী জবাইকারীকে দিয়ে দেবে। এবং তার থেকে জন্তুর মূল্য গ্রহণ করবে।

২. জন্তুটি নিজে নিয়ে নেবে। জবাইকারী থেকে জবাইয়ের ক্ষতিপূরণ নেবে। আল্লামা শামী (রহ.) লেখেন–

قال العلامة ابن عابدينؒ ومن ذبح شاة غير فمالكها بالخيار ان شاء

শরীয়ত কর্তৃক সংরক্ষিত ও সম্মানিত। সম্পদ সংরক্ষণের জন্য লড়াই করাকেও শরীয়ত বৈধ বলেছে। নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায়, সে হবে জান্নাতি। জবরদখলকারী মারা গেলে সে হবে জাহান্নামী। যেমন–রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

عن ابى هريرةؓ قال جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال يارسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالى قال: فلا تعطه مالك قال ارأيت ان قاتلنى قال قاتله قال اريت ان قتلنى قال فانت شهيد، قال ارايت ان قتلته قال هو فى النار (مسلم رقم الحديث ١٤٠)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলুন তো কেউ যদি আমার মাল ছিনিয়ে নিতে চায় তাহলে আমার করণীয় কী? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার মাল তাকে দিয়ো না। সে আবার প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি আমার সাথে লড়াই করে? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, তুমি লড়াই করো। সে আবার প্রশ্ন করল, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, তবে তুমি শহীদ। সে আবার প্রশ্ন করল, আর যদি আমি তাকে হত্যা করি? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম শরীফ)

النقصان، والا فلا شئ عليه- (تنقيح الحامدية: ١٧٢/٢ كتاب الغصب ومثله فى الفتاوى الكاملية : ٢٠٩ كتاب الغصب)

জবরদখলকৃত সম্পদ অন্যজনে জবরদখল করলে তার বিধান :

কেউ অন্য কারো সম্পদ জবরদখল করল। অতঃপর এই সম্পদ তার থেকে আরেকজন জবরদখল করে নিয়ে গেল। উদাহরণস্বরূপ, কেউ অন্য একজনের একটি গাড়ি গসব করে নিয়ে গেল। গাড়িটি তার থেকে আরেকজন গসব করে নিয়ে গেল এবং তার হাতেই গাড়িটি নষ্ট হয়ে গেল। এমতাবস্থায় গাড়ির প্রকৃত মালিকের জন্য উভয় গসবকারীর যেকোনো একজন থেকে উক্ত গাড়ির ক্ষতিপূরণ উসূল করার অধিকার থাকবে।

ولو غصب شخص متاع انسان او سيارته فجاء شخص آخر فغصب هذا المتاع من الغاصب او اغتصب السيارة او الدابة، ثم هلك فى يده فمن يضمن هذا المغصوب؟ اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على ان المالك بالخيار ان شاء ضمن الغاصب الاول لوجود فعل الغصب منه فهو المتعدى الاول، وان شاء ضمن الغاصب الثانى (فقه المعاملات)

জবরদখলকারীদের প্রতিরোধে শরীয়তের বিধান :

কারো সম্পদ কেউ অন্যায়ভাবে দখল করতে চাইলে মালিকের বৈধ অধিকার রয়েছে তা প্রতিহত করার এবং নিজ সম্পদ সংরক্ষণের পূর্ণ চেষ্টা করার। প্রথমে প্রতিবাদ করবে, প্রয়োজনে প্রতিহত করবে। কেননা প্রতিটি ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জত

ضمنه قيمتها وسلمها اليه، وان شاء اخذها وغرمها النقصان تنقيح الحامدية ١٧٥/٢، كتاب الغصب، هكذا فتاوى تاتار خانية على هامش الهندية ٢٤٥/٣)

জবরদখলকৃত ভূমি থেকে অর্জিত মুনাফার বিধান :

কারো জমি জবরদখল করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া উভয় কাজই হারাম। দখল অবস্থায় জমি থেকে আসা সকল মুনাফার মালিক জমির মালিকই। তাই মূল মালিক জবরদখলকারী থেকে বিগত দিনের মুনাফা দাবি করতে পারবে। তবে সমাজে প্রচলিত বর্গা চাষের নিয়মানুসারে দখলকারীর ওপর বিগত দিনের ভাড়া পরিশোধ আবশ্যক হবে। ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ রয়েছে–

وفى العالمغيرية وسئل شيخ الاسلام عطاء بن حمرة عمن زرع ارض انسان ببذر نفسه بغير اذن صاحب الارض هل لصاحب الارض ان يطالبه بحصة الارض قال نعم ان جرى العرف فى تلك القرية انهم يزرعون الارض بثلث الخارج او ربعه او نصفه او بشئ مقدر شائع يجب ذلك القدر الذى جرى به العرف (الفتاوى العالمغيرية ١٤٤ باب العاشر فى زراعة الارض المغصوبة)

قال العلامة الحصكفىؒ فالحاصل ان من زرع ارض غيره بلا اذنه ولو على وجه الغصب، فان كانت الارض ملكا واعدها ربها الزراعة اعتبر العرف فى الحصة ان كان ثمة عرف، والا فان اعدها للايجار الخارج كله للزراع، وعليه اجر مثلها لربها، والا فان انتقصت فعليه

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

আপনারা কি তা পেতে চান না?

হাদীস শরীফে আছে–

تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (مشكوة ٣١/١)

আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে গেলাম। যত দিন পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে, গোমরা হবে না। দুই. বস্তু পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ এবং সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

প্রিয় ভাইয়েরা! দুনিয়াতে বড়রা তাঁর ছোটজনের কল্যাণ আর সফলতা চায়। চায় অর্জিত কল্যাণ ও সফলতা অটুট থাকুক। প্রত্যেকে চায় আমার ছেলেসন্তান শিক্ষিত হোক, উন্নতি করুক। যখন প্রত্যেক বড়দের চাওয়া এটি তাহলে রাহমাতুললিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের জন্য কল্যাণ ও সফলতার চাওয়া কিরূপ হবে? তাঁর চাওয়া হবে অতুলনীয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, بالمؤمنين رؤف الرحيم ঈমানদারদের জন্য বড়ই দয়াশীল এবং মেহেরবান।

এই কারণে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, দেখো, আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বালা-মুসীবতের পর যে ইজ্জত ও সম্মান দিয়েছেন, পেরেশানির পর শান্তি দিয়েছেন, অপমানের পর ইজ্জত দিয়েছেন, কষ্টের পর আরাম দিয়েছেন, তা যদি তোমরা অব্যাহত রাখতে চাও তবে দুটি বিষয়কে গুরুত্বসহকারে ধারণ করো। যত দিন পর্যন্ত এই দুটি বিষয়কে গুরুত্বসহকারে আঁকড়ে থাকবে, তত দিন পেরেশনা হবে না, অপমাণিত হবে না। সে দুটি বস্তু হলো আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন মজীদ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের)-এর সুন্নাত। تمسكتم بهما একে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো (অর্থাৎ পাঁচ আঙুলে শক্ত করে ধরে রাখো)।

আমাদের অধঃপতনের কারণ কী?

আমরা উপরে উল্লেখিত বিষয়ের ওপর আদিষ্ট ছিলাম। কিন্তু আমরা উক্ত হাদীসের ওপর আমল ছেড়ে দিয়েছি। এটিই আমাদের পতনের মূল কারণ। এই হাদীসে সফলতার রাস্তাও বাতানো হয়েছে, পতনের রাস্তাও বলা আছে। আমরা তো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে রেখেছি, কিন্তু আমরা কেউ কেউ দুই আঙুলে এগুলো ধরে রেখেছি, কেউ কেউ তিন আঙুলে আঁকড়ে রেখেছি। পাঁচ আঙুল দিয়ে ধারণকারী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক কম পাওয়া যাবে। আল্লাহওয়ালা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, পাঁচ আঙুল দিয়ে ধরার মতো ব্যক্তি সে যুগে শতভাগ পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমান যুগে সেরূপ ব্যক্তি শতকরা দু-একজনই পাওয়া যায়।

পবিত্র কুরআনের হকসমূহ :

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাত মূল বস্তু। একে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। পবিত্র কুরআনের চারটি হক। ১. মহত্ব ২. মহব্বত ৩. আহকামের অনুসরণ ৪. শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত। এই চারটি হক পবিত্র কুরআনের। আজ কুরআনের মহত্ব অন্তর থেকে চলে গেছে, মুহাব্বত হ্রাস পেয়েছে। পবিত্র কুরআনকে যেভাবে ভক্তি ও মুহাব্বত করার কথা ছিল তা করা হয় না। পবিত্র কুরআনের আহকামের অনুসরণও কমে গেছে। শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত তো আরো হ্রাস পেয়েছে।

শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের হুকুম :

পবিত্র কুরআন সহীহ-শুদ্ধ তাজবীদের সাথে পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

ورتل القرآن ترتيلا পবিত্র কুরআন তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করো। তারতীলের ব্যাখ্যা কী? তাফসীরে ইতকানে হযরত আলী (রা.)-এর একটি বর্ণনায় আছে–

تجويد الحروف ومعرفة الوقوف

হরফকে সহীহ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা এবং ওয়াকফের পদ্ধতি জানা।

কুরআন তেলাওয়াত করার সময় শ্বাস কিভাবে ছাড়বে, কোথায় ছাড়বে, এর কায়দা বা নিয়ম কী? কোনো ড্রাইভার যদি গাড়ি নিয়ে পার্কিংয়ের মুখে রেখে দেয় তা ভুল, আবার যদি পার্কিংয়ের মধ্যখানে রাখে তাও ভুল। বরং তাদের নিয়মমতেই রাখতে হবে। তেমনি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সময় নিঃশ্বাস কোথায় ছাড়বে এবং মধ্যখানে থামতে হলে কিভাব থামবে? আবার তা কোথা হতে আরম্ভ করবে এসবের বিস্তারিত নিয়মনীতি রয়েছে। এসব নিয়মনীতির পরিপন্থী হলে পবিত্র কুরআনের শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বসুন্ধরা মারকায, চট্টগ্রামের শুলকবহর মাদরাসাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) আকদে নিকাহের অনুষ্ঠান এবং হাদীসের দরসে বিবাহের শরয়ী নীতিমালা, সুন্নত তরীকা, সমাজে প্রচলিত রুসুম সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান ও তাকরীর পেশ করেন। তাঁর তাকরীর ও বয়ানগুলোর আলোকে প্রমাণিক এই প্রবন্ধটি সাজানো হয়েছে।

ইসলামী বিয়ে-১৩

দুই. বিবাহের অনুষ্ঠানে মেয়েদের বেপর্দা অংশগ্রহণ

বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীদের পর্দাহীন অবাধে অংশগ্রহণ ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং অসংখ্য ফিতনার মূল উৎসও বটে। কোনো আকলমন্দ প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে এটা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের যেসব চাহিদা, তা পূরণ করতে পুরুষদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। কতজন ঋণগ্রস্ত হয়ে যান, তা আল্লাহই ভালো জানেন। নিরূপায় হয়ে অনেকে আবার হারাম উপার্জনে বাধ্য হন। পারিবারিক কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে। অন্যতে মুগ্ধ হয়ে পরকীয়ায় জড়ানো,

অবশেষে সংসারের ভাঙনের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক ঘটনাই ঘটে যায়। আর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ তো রয়েছেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان অর্থাৎ নারীরা ঘরে থাকার বস্তু। ঘর ছেড়ে বের হলে শয়তান তাদেরকেও নষ্ট করে আবার পুরুষকেও প্ররোচিত করে। (তিরমিযী)

তিন. পারফিউম

বিবাহ অনুষ্ঠানে মেয়েরা পারফিউম ব্যবহার করে পর পুরুষের পাশ দিয়ে চলাফেরা, সাথে বসা ইত্যাদি হরহামেশা করে থাকে। অথচ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে এটা কত বড় অপরাধ ও গুনাহের কাজ, তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস থেকে শুনে নিন। ইরশাদ করেন : ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهى زانية অর্থাৎ যে নারী খুশবু ব্যবহার করে পরপুরুষদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে যেন পুরুষরা তার ফারপিউমের সুঘ্রাণ পায়, তাহলে ওই নারী একজন ব্যভিচারিণী। (নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

চার. সহঅবস্থান

যেকোনো অনুষ্ঠানে নারীদের বেপর্দা উপস্থিতি ফেতনা। আর নর-নারীর সহঅবস্থান ও সম্মিলন আরো মারাত্মক গুনাহ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন الا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب : الا ان يكون ناكحا او ذا محرم অর্থাৎ খবরদার স্বামী বা মাহরাম ব্যতীত কোনো পুরষ যেন কোনো নারীর সাথে সহঅবস্থান না করে। (মুসলিম)

অন্যত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন : اياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله ارأيت الحمو قال الحمو الموت সাবধান! তোমরা পরনারীদের কাছেও যেও না। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে আপনার রায় কী? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, দেবর তো মৃত্যুর সমতুল্য। (বুখারী, মুসলিম) অর্থাৎ : মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে মানুষ বাঁচতে চায়, নারীরাও সেভাবে দেবর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলবে।

নর-নারীর সহাবস্থান নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : فان الشيطان يجرى من احدكم مجرى الدم ভাবার্থ হলো, শরীরে রক্ত প্রবাহমান অথচ তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। ঠিক তেমনি শয়তানের প্ররোচনায় তার ফাঁদে আটকে যাবে টেরও পাবে না।

পাঁচ. স্টেজ

অনেকের মুখে শুনেছি, কমিউনিটি সেন্টারে নব দুলা-দুলহান উভয়ের জন্য স্টেজ থাকে, যেখানে তারা উপবেশন করে। আগন্তুক অতিথিরা (নারী-পুরুষ ভেদে সকলেই) তাদেরকে উপহার সামগ্রী পেশ

করেন। মুখরোচক বিভিন্ন উক্তি করেন। এই স্থলে নারীরা নব দুলহাকে আর পুরুষরা দুলহানকে এক নজর দেখে নেন। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন মন্তব্য।

একটু চিন্তা করে দেখুন, চরম সাজে সজ্জিত দুলা-দুলহানকে যারা দেখতে যান, তাঁদের সাজেও কিন্তু কোনো ঘাটতি থাকে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে আরো বেশি আকর্ষণীয় সাজে সেজে যান। এমতাবস্থায় এমনটি হওয়া কি স্বাভাবিক নয় যে, দুলার দৃষ্টি তার নববধূর চেয়েও সুন্দরী ও আকর্ষণীয় রূপবতী আগন্তুক কোনো মেয়ের ওপর নিবদ্ধ হবে এবং তার রূপ-লাবণ্য দুলার অন্তরে ঝড় তুলে নিমিষেই নবজীবনের শুরুলগ্নেই সব আনন্দ ফুর্তি মনোকষ্ট ও আপসোসে পর্যবসিত হবে। আর ওই ভালোলাগা মেয়েটিকে নববধূর স্থানে নিজের চিন্তা-চেতনায় ঠাঁই দেয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঠিক নবদুলহানের মণিকোঠায় ও কোনো সুঠাম আকর্ষণীয় পুরুষ একই ধরনের ঝড় বয়ে দিতে পারে। এভাবেই ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত ঘটবে, যা সাংসারিক জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে নিঃসন্দেহে। আরে ভাই! নবদম্পতি ছাড়া আগন্তুক অন্য অতিথিদের বেলায়ও কিন্তু এমনটি ঘটতে পারে এবং ঘটছেও তাই।

ছয়. ফটোগ্রাফি

বিবাহের অনুষ্ঠানে অনেককে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে খুবই আগ্রহী মনে হয়। তারা এটা কেন করতে চায়, বুঝে আসে না। কোনো চেতনা বোধসম্পন্ন ব্যক্তি এটা সমর্থন-পছন্দ কোনোটাই করতে পারে না। কোনো মুসলমান কি এতটুকু আত্মসম্ভ্রমহীন হতে পারে যে, কেউ তার স্ত্রী, বোন, মা, ভাগ্নি ও অন্যান্য আত্মীয়ের ছবি ক্যামেরাবন্দি করে নিয়ে যাবে বা নিজেই সংরক্ষিত করে রাখবে। আর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এগুলো দেখে ভেতরে ভেতরে লালায়িত হোক ও মজা করুক? এ ছাড়াও ছবি উঠানোর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান অত্যন্ত কঠোর, যা কারো অজানা থাকার কথা নয়।

সাত. ভিডিও ফিল্ম

ফটোগ্রাফির চেয়েও জঘন্য নির্লজ্জ যে কাজটি বিবাহ অনুষ্ঠানে বা আগে-পরে করা হয় তাহলো ভিডিও ফিল্ম তৈরি করা। এ জন্য বহু টাকা খরচ করে ভিডিওম্যান ভাড়া করা হয়। তাদের শারীরিক ভাষা অনেকটা এ রকম যে ভাই অনুগ্রহপূর্বক তুমি ক্যামেরা দিয়ে আমাদের মা, বোন, মেয়ে, ভাগ্নি, ভাতিজি ও অন্যান্য আত্মীয়ের শরীরের আকর্ষণীয় অঙ্গের বিভিন্ন অ্যাংগেলে ভিডিওচিত্র ধারণ করো। কোনো সময় মাথায় ইবলিসী শখ চেপে বসলে নিজেও দেখব অন্যকেও দেখাতে ভুল করব না। অতঃপর মুভি মেকার দিয়ে খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলো পূর্ণ ফিল্মে রূপান্তর করে এর কপি নিজের বন্ধুবান্ধবদেরও মহা মূল্যবান উপঢৌকন হিসেবে পেশ করে। শারীরিক ভাষা অনেকটা এ রকম যে, জনাব গ্রহণ করুন, খুব আকর্ষণীয় হয়েছে, দেখে পুলকিত হবেন, উপভোগও করতে পারবেন? নাউযুবিল্লাহ্

তিক্ত হলেও বাস্তবতা এটাই যে, যেখানে এগুলো হচ্ছে, সেখানে এমনটাই ঘটছে। এগুলোর মন্দ দিকগুলো বোঝার জন্য হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মানবিক চিন্তা-চেতনাই যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন।

আট. গাড়ি সাজানো

রংবেরংয়ের ফুল দ্বারা বরের গাড়ি সাজানো শহরী বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এর প্রভাব গ্রাম্য বিবাহেও পরিলক্ষিত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব অপব্যয়ের শামিল। আর এত সব আয়োজন যে লোকদেখানো, গৌরব ও অহংকারের বশীভূত হয়ে করা হয় তা অনস্বীকার্য, যা সম্পূর্ণভাবে হারাম।

নয়. বৈরাতি খানা

ধুমধামের সাথে বৈরাতি খানা না হলে তো বর্তমানে বিবাহই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনে রাখবেন! যত বেশি ধুমধাম হবে, তত বেশি বদনাম হবে। চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারব, যারা ধুমধামের সাথে আয়োজন করে খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছে, তাদের কপালে কুখ্যাতি আর বদনাম ছাড়া কিছুই জোটেনি। আরে ভাই! যাদের জন্য আপনি কষ্টার্জিত সম্পদ উড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী কতজন আছে? তাদের মুখনিসৃত উক্তিগুলো আপনার কর্ণকুহরে পৌঁছলে শুনতে পারবেন, তারা আপনার ঘাম ঝরানো আয়োজন নিয়ে কত কটূক্তি, অভিযোগ, তিরস্কার আর উস্কানিমূলক মন্তব্যই না করে যাচ্ছে। বিশ্বাস না হলে কান লাগিয়ে শুনে দেখবেন, প্রমাণ হয়ে যাবে। আয়োজনকে ঘিরে কত পরিবারের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি

হয়েছে। সংসার তছনছ হয়েছে এর কোনো ইয়ত্তা নেই। আবার কত জায়গায় আয়োজনস্থলে কথাকাটাকাটি, একপর্যায়ে হাতাহাতি অবশেষে সব কিছু পণ্ড হয়ে গেছে, এমন অপ্রীতিকর ঘটনার ফিরিস্তিও ছোট হবে না।

বৈরাতির আয়োজন হারাম হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত থানভী (রহ.) বলেন :

آج کل خود بارات ہی جمع معصیت ہے، اگر کوئی خرابی نہ ہو تو یہ خرابی تو ضرور ہی باراتوں میں ہوتی ہے کہ عموماً باراتی مقدار دعوت سے زائد جاتے ہیں جسکی وجہ سے بے چارے میزبان کو سخت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے،

বর্তমানে বৈরাতির আয়োজন মানেই গুনাহের আয়োজন। বৈরাতির আয়োজনে অন্য কোনো মন্দ দিক থাকুক বা না থাকুক, এটা তো অবশ্যই আছে যে, বরযাত্রীর সংখ্যা দাওয়াতি সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়। (ইসলামী শাদী ১৭১) অর্থাৎ ৫০ জন আসার কথা থাকলে আসে ৭০ জন, ১০০ জনের জায়গায় ১৩০-১৫০ জন। ফলে মেয়েপক্ষকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরনের মেহমানদের ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন : دخل سارقا وخرج مغيرا চোরের মতো প্রবেশ করে সন্ত্রাসী লুটেরার মতো বের হয়ে গেল। (মিশকাত)

এর অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্ট সংখ্যায় এলে বৈরাতি খানা বৈধ হয়ে যাবে। কারণ, যে খানা জুলুমের ভিত্তিতে হয় বা একপ্রকার জোরপূর্বক, গৌরব, নাম, খ্যাতি, লোকদেখানো বা না খাওয়ালে বদনাম হওয়ার ভয়ে হয়, তা কখনো জায়েয হতে পারে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه সাবধান! তোমরা জুলুম করো না। খবরদার কোনো মুসলমানের মাল তার সন্তুষ্ট ব্যতিরেকে হালাল নয়।

মনে রাখবেন, কনেপক্ষের মুখের কৃত্রিম হাসি সন্তুষ্টির পরিচায়ক নয়। এমনটা হলে তো ওই ডাকাতদলের ডাকাতিকেও বৈধতা দিতে হবে, যারা ডাকাতি শেষে গৃহস্থকে হাসিমুখে তাদেরকে বিদায় দিতে বাধ্য করে। যারা এটাকে বৈধতা দিতে পারেন না তারা মানবরূপী রক্তপিপাসুদের এমন জঘন্য অপকর্মকে কিভাবে বৈধতা দেবেন?

অনেকে বলেন, যাদের সামর্থ্য আছে তারা কোনো প্রকার চাপ ছাড়া স্বেচ্ছায় বৈরাতি খানার আয়োজন করলে অসুবিধা কোথায়? হ্যাঁ, বিবেক থাকলে বহু জায়গায় অসুবিধা খুঁজে পাবেন। যেমন :

১. অবৈধ কাজ স্বেচ্ছায় করলে তা বৈধ হয়ে যায় না।

২. ব্যক্তিবিশেষের জন্য অবৈধ কাজ বৈধতা পায় না।

৩. এই সামর্থ্যবান ব্যক্তিটি ও নিজের কলিজার টুকরা কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই (কথিত) স্বেচ্ছায় ডাকাতদলকে আমন্ত্রণ জানান। যেমন : বৈরাতি খানার আয়োজন না করলে শ্বশুরালয়ে মেয়ে ছোট হয়ে থাকতে হবে। খোঁটা, তিরস্কার, কটূক্তি শুনতে হবে। বিভিন্নভাবে হেয়প্রতিপন্ন এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হবে। চর্মচক্ষু দিয় নয়, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে (কথিত) স্বেচ্ছায় এই আয়োজনকে বরণ করার পেছনে আরো ভয়াবহ লোমহর্ষক কোনো কারণও সামনে ভেসে উঠতে পারে। সম্ভব হলে নির্জনে তার সাথে কথা বলে দেখুন, প্রকৃত সত্য বেরিয়েও আসতে পারে। মনে রাখবেন, জোরপূর্বক কারো ঘরে খানা খাওয়ার চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে খাওয়া অনেক শ্রেয়।

সুতরাং মনগড়া যুক্তি বলে এই আয়োজনকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করাই হবে একজন প্রকৃত নবীপ্রেমিকের কাজ। 'খেয়েছি যখন খাওয়াতে হবে'–এই মানসিকতাকেও ত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হতে হবে। তাওবা পরিহার করার নাম, পুনরায় বরণ করার নাম নয়।

দশ. চড়া মোহর :

মোহর নির্ধারণ করা বিবাহের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মোহর স্ত্রীর পাওনা, যা স্বামীকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। মোহর পরিমাণে যত কম হবে, আদায় করা তত সহজ হবে এবং এটা বরকতময়ও। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

اعظم النساء بركة ايسرهن صداقًا

সর্বাধিক বরকতময় নারী সে, যার মোহর পরিমাণে কম। (মুসতাদরাক হা. ২৭৮১)

অন্যত্র ইরশাদ করেন : من يمن المرأة ان يتيسر صداقها মোহর কম হওয়া নারীর বরকতময় হওয়ার দলিল। (মুসতাদরাকে হা. ২৭৮৮)

মহরে ফাতেমী : অনেককে মোহরে ফাতেমী নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখা

যায়। সামর্থ্যের দিকে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। যার সামর্থ্য নেই সেও মোহরে ফাতেমী নির্ধারণ করে। আবার যার বেশি দেওয়ার মতো সামর্থ্য আছে, সেও। বাস্তব কথা হলো, সামর্থ্যবানের জন্য মোহরে ফাতেমী বরকত। আর মোহরে ফাতেমীর পরিমাণ মোহর আদায় করার মতো যার সামর্থ্য নেই, তার জন্য মোহরে ফাতেমী নয়। বরং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর নির্ধারণ করা উত্তম।

চড়া মোহর : পাঁচ লাখ, দশ লাখ এমনকি কোটি টাকা পর্যন্ত মোহর ধার্য্য করা বর্তমানে বিবাহের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এক শ্রেণীর লোককে বলতেও শোনা যায়, আরে ভাই! যা ইচ্ছা নির্ধারণ করুক, অসুবিধা নেই। মোহর কেউ আদায়ও করে না আবার কেউ নেয়ও না। ফরমালিটি ম্যান্টেনের জন্য উল্লেখ করা হয় মাত্র। দেওয়া-নেওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই? আসতাগফিরুল্লাহ। দুটি কথা খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে শুনুন!

১. মোহর অতিমাত্রায় বেশি নির্ধারণ করা ইজ্জত-সম্মান ও ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। আবার সামর্থ্য অনুযায়ী কম হলেও অসম্মানের কিছু নেই। তাই তো হযরত উমর (রা.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন :

الا لا تغالوا صداق النساء فانها لو كانت مكرمة فى الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها واحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم وان احدكم ليغلى بصداق امرأته حتى يكون بها عداوة فى نفسه،

সাবধান! তোমরা চড়া মোহর ধার্য্য করো না। কারণ, এটা যদি দুনিয়াতে ইজ্জত-সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক হতো অথবা আল্লাহর নিকট তাকওয়া ফরহেজগারীর কোনো আমল হিসেবে গণ্য হতো তাহলে সবচেয়ে বেশি এ কাজটি স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই করতেন। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কোনো স্ত্রী বা মেয়ের মোহর সাড়ে বারো উকিয়ার (১৩৫ /১৫০ তোলা রুপা) বেশি কারো মোহর নির্ধারণ করেননি। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মোহর অতিমাত্রায় বেশি ধার্য্য করছো। মনে রেখো, এর ফলে তোমাদের অন্তরে স্ত্রীদের প্রতি শত্রুতার সূত্রপাত হবে। (মুসতাদরাক হা. ২৭৭৪, ২৭৭৭)

হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, من اول شومها ان يكثر صدقاتها নারী প্রথমসারির অপাঙ্‌ক্তেয়, অলক্ষী, বরকতহীন হওয়ার দলিল তার মোহর মাত্রাতিরিক্ত হওয়া। (মুসতাদরাক হা. ২৭৮৮)

উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলো থেকে বুঝে আসে, মহরের পরিমাণ আকাশচুম্বী হওয়া ইজ্জত-সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক নয়। বরং বেইজ্জতি অশান্তি ও অভদ্রতার শিকড় মাত্র।

২. যারা মোহর ধার্য্য করে অনাদায়ের নিয়তে প্রথমত তারা চরম পর্যায়ের মুনাফিক ও ধোঁকাবাজ। আর হাদীসের ভাষায় তারা ব্যাভিচারী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

من اصدق امرأة صداقا وهو مجمع على ان لا يوفيها اياه لقى الله تعالى وهو زان،

যে ব্যক্তি স্ত্রীর মোহর ধার্য্য করল অথচ তার নিয়ত হলো স্ত্রীকে তা পরিশোধ না করা তাহলে সে হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআ'লার সামনে একজন ব্যভিচারী হিসেবে উপস্থিত হবে। (তাবারানী)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তার মৃত্যু হবে একজন ব্যভিচারী হিসেবে। (কানযুল উম্মাল হা. ৪৪৭২১)

সুতরাং ভেবে দেখুন, আমাদের মধ্যে যারা ফরমালিটি ম্যান্টেনের জন্য মোহর ধার্য্য করে লক্ষ, নিযুত, কোটির অঙ্কে তাদের হাশর কেমন হবে। আরে ভাই! আদায় করার নিয়ত থাকলেও তো মোটা অঙ্কের মোহর ধার্য্য করা অনুচিত, যা হযরত উমর (রা.)-এর ভাষণ থেকে বুঝে আসে। আর সামর্থ্যের বাইরে হলে তো নিঃসন্দেহে নিষেধ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, لا ينبغى لمؤمن ان يذل نفسه قيل يا رسول الله كيف يذل نفسه قال تحمل من البلاء ما لا يطيقه "কোনো মুমিনের জন্য নিজেকে অপদস্থ করা অনুচিত। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! নিজেকে আবার কিভাবে অপদস্থ করা হয়? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সামর্থ্যের বাইরে কোনো বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেওয়া।" আর যদি আদায়ের নিয়তেই আকাশচুম্বী মোহর ধার্য্য করা হয় তাহলে বিচ্ছেদ ঘটলে স্ত্রীর পাওনা-দাওনা নিয়ে এত দেনদরবার করতে হয় কেন? মামলা-মোকাদ্দমায় জড়িয়ে আদালতের বারান্দা ঘুরে লাল দালান

পরবর্তী ঠিকানা হয় কেন? নয়তো আত্মগোপন বা দেশত্যাগের মতো কাপুরুষের পথ বেছে নেওয়া হয় কেন? আর স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রী নিজের মোহর তলব করলে তার সাথে অমার্জনীয় অপরাধীর মতো আচরণ করা হয় কেন?

আসল কথা হলো, আদায় করার নিয়ত তখনই থাকে, যখন পরিমাণে কম হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ও সামর্থ্যের মধ্যে থাকে। অন্যথায় নিয়ত শব্দটি প্রতারণার পথকেই উন্মোচন করে।

এগার : যৌতুক

যৌতুকই হচ্ছে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের মূল কারণ। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, গৃহ-বিবাদের ২০ থেকে ৫০ ভাগের জন্য দায়ী হচ্ছে যৌতুক। যৌতুকের জন্য নারীরা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে মানসিক ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারের শিকার। ২০১০ সালে Bangladesh Society for the Enforcement of Human Rights (BSEHR)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র যৌতুকের বলি হয় প্রতি হাজারে ২৪৯ জন বিবাহিতা নারীর জীবন। যৌতুকের কারণে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রতি ঘণ্টায় ১২ জন নারীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত Harvard I Johns Hopkins বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিবছর ভারতে এক লক্ষ নারীকে পুড়িয়ে মারা হয়, যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অন্তত ৫-৬ গুণ বেশি। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল পপুলেশন রিসার্চের বিখ্যাত জার্নাল Lancet-এ প্রকাশিত হয়। ভারতে গত ১০ বছরে ১২ মিলিয়ন গর্ভস্থ কন্যাশিশু হত্যার জন্য যৌতুক প্রথাকেই দায়ী করা হয় ।

যৌতুকের প্রচলন কিভাবে শুরু হয়?

যৌতুক প্রথার উৎপত্তি হিসেবে 'কন্যাদান' অথবা 'স্ত্রীদান' নামক হিন্দুদের একটি ধর্মীয় রীতিকে গণ্য করা হয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী, পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোনো অধিকার নেই। বিয়ের পর থেকে কন্যার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বামীর ওপর বর্তায়। এ জন্য বিয়ের সময় পিতা কন্যাদান রীতির মাধ্যমে কন্যার স্বামীকে খুশি হয়ে কিছু উপহার বা দক্ষিণা দেন। আবার পিতার দক্ষিণা ছাড়া কন্যাদান তথা বিবাহ ধর্মীয়ভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই দক্ষিণাই কালাতিক্রমে বর্তমান সমাজে বাধ্যতামূলক ও সাধ্যাতিরিক্ত যৌতুকে বিবর্তিত হয়েছে ।

শুরুর দিকে কন্যাদান উচ্চবর্ণের হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও তা অনুসরণ করা শুরু করে। কালের বিবর্তনে হিন্দু সংস্কৃতির জঘন্য প্রভাব বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ ব্যবস্থাকেও গ্রাস করে নিয়েছে।

বর্তমানে ছেলে বিত্তশালী হওয়ার সহজ মাধ্যম হচ্ছে, যৌতুক। এটা রীতিমতো ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। চাকরিবাকরি, বিদেশ গমন, উন্নত দেশগুলোর নাগরিকত্ব লাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, বিয়ের খরচ বাবদ নগদ অর্থ গ্রহণ, গাড়ি, মোটরসাইকেল এবং ঘর সাজানোর যাবতীয় উপকরণসহ আরো অনেক কিছুই এখন যৌতুকপ্রথার অন্তর্ভুক্ত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের এক কন্যাকে বিয়ে দিতেই পুরো পরিবারকে হতে হয় নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন। শিক্ষিত সমাজে উচ্চ হারে যৌতুক নেয়ার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্য সমাজেও একসময় যৌতুকসদৃশ প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে শিল্প বিপ্লবের জোয়ারে বর্তমানে সেখানে এ প্রথাটির প্রায় বিলুপ্তি ঘটেছে ।

অবাক হওয়ার কথা, যে প্রথাটির অস্তিত্ব আরবসহ পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে নেই। হিন্দু ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে নেই। এমন একটি বিকৃত প্রথা মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সমাজ কলঙ্কযুক্ত হলো কিভাবে? এর মূলে তিনটি কারণ দাঁড় করানো যায়। ১. শরয়ী বিধানাবলির প্রতি উদাসীনতা। ২. পার্শ্ববর্তী দেশের সমাজে প্রচলিত বর্ণ প্রথা। ৩. অতিশয় লোভ।

বাংলাদেশে যৌতুক প্রথার প্রচলন

ইসলামী আইনে বাধ্যতামূলক পাত্রীকে মোহরানা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে উল্টো পাত্রীপক্ষকে যৌতুক দিতে বাধ্য করা হচ্ছে! ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে যৌতুক নামক প্রথা অপরিচিত ছিল। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে ১৯৪৫-১৯৬০ সালে যৌতুকের হার ছিল ৩%। ১৯৮০ সালে আইনগতভাবে যৌতুক নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এর পর থেকে যৌতুকের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

যৌতুক প্রথা প্রচলনের মূল কারণ

১. হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে ।

২. অনেকের মতে, আমাদের দেশে যৌতুক প্রথা প্রতিষ্ঠার পেছনে মুসলিম বিবাহসংক্রান্ত আইন-কানুন পরিবর্তন (দ্বিতীয় বিবাহে অত্যন্ত কঠোরতা ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনত ঝামেলাপূর্ণ) হওয়াই দায়ী।

৩. যৌতুক গ্রহণে মানুষের লোভ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের তরুণ সমাজের বেশির ভাগ যৌতুককে খারাপ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে। কিন্তু দুর্মূল্যের বাজারে ফাও (বিনা পরিশ্রমে) পেতে সবারই প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা থাকে। এ জন্য সাধারণত পাত্রপক্ষকে ঘর সাজানোর উপকরণ সংগ্রহে উদগ্রীব দেখা যায়।

৪. শরয়ী বিধানের প্রতি উদাসিনতা ও অবজ্ঞা করা।

যারা যৌতুক নেন না, তারাও কি যৌতুক থেকে মুক্ত?

অনেক পরিবারে যৌতুক প্রথা সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। যদিও প্রকাশ্যে তাদের পক্ষ থেকে কোনো দাবি করা হয় না; কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী বরপক্ষের অনেক দাবিই পূরণ করা হয়। নয়তো পাত্রীপক্ষকে অনেকটা চাপের মুখেই থাকতে হয়। নিঃসন্দেহে এটাও যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এসব অপ্রকাশ্য দাবি-দাওয়ার ব্যাপারেও একজন খাঁটি মুসলমানকে সংযত থাকতে হবে।

সমাজের করুণ চিত্র

অসংখ্য মন্দে ভরা সমাজে আজ নিরাপত্তা, শান্তি, উদারতা, বন্ধুত্ব, প্রেম-ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের মত অফুরন্ত নেয়ামত হারিয়ে যাওয়ার মুখে। সমাজ আজ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এর অন্যতম অভিশপ্ত যৌতুক। এই পোকা মানবজাতির রক্ত গোশত, হাড্ডি সব কিছুকে চুষে খাচ্ছে। এর আক্রমণে মানবতার ক্ষতবিক্ষত করুণ চেহারা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। তবুও নিম্নে কয়েকটি ভয়াবহ দিক তুলে ধরা হলো।

১. দেউলিয়া

পাত্রীপক্ষ সামর্থ্যের বাইরে যৌতুক দিতে গিয়ে এমনভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় যে, তা পরিশোধ করা সম্ভবপর হয় না। ফলে তাদের চোখের সামনে রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসে। আর যদি যৌতুক পাত্রপক্ষের মনঃপূত না হয় তাহলে পাত্রীর ওপর বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় আচরণ করা হয়। তাকে শুনতে হয় তিরস্কার, উস্কানিমূলক মন্তব্য। সহ্য করতে হয় আরো অনেক কিছু। এই পরিস্থিতিতে পাত্রীপক্ষ প্রভাবশালী হলে মামলা-মোকাদ্দমার অফুরন্ত পথচলা শুরু হয় পাত্রপক্ষের বিরুদ্ধে। এভাবে কত পরিবার ধ্বংস ও দেউলিয়া হয়েছে, এর কোনো হিসাব নেই।

২. বিরাট অঙ্কের মোহর

মোটা অঙ্কের মোহর ধার্য্য করার মূলে রয়েছে অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার বিরাট অবদান। এটা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

৩. তালাক

প্রতিনিয়ত তালাকের প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। এর মূলেও কিন্তু যৌতুক প্রথাই দায়ী। যৌতুক চেয়ে না পেলে বা চাহিদা অনুপাতে না হলেই শুরু হয় পাত্রীর ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন। এর পরও পাত্রীপক্ষ চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হলে পাত্রপক্ষ বেছে নেয় বিবাহ বিচ্ছেদের মতো আরেকটি জঘন্য পথ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাত্রীপক্ষ নিজেরাই অবলম্বন করে ডিভোর্সের মতো আরেকটি বিতর্কিত (শরয়ী দৃষ্টিতে) পথ।

৪. নৈতিক অধঃপতন

বিবাহবহির্ভূত দৈহিক সম্পর্কের পেছনেও যৌতুক প্রথা অনেকাংশে দায়ী। ভরা যৌবনেও ছেলেমেয়ের বিয়ে সম্পন্ন না করে বিলম্বিত করার মূলে পাত্রপক্ষ আশানুরূপ যৌতুক না পাওয়া আর পাত্রীপক্ষ চাহিদা মোতাবেক যৌতুকের ব্যবস্থা করতে না পারাই দায়ী। ফলে যুবক-যুবতীরা তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণে বেছে নেয় ব্যভিচারের পথ। এভাবেই তারা নিজেদের পবিত্রতা নষ্ট করে। ধ্বংস করে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে নাক-কান কাটা যায় নিজের, পরিবারের, আত্মীয়স্বজনের ও পুরো বংশের। অবশেষে নিগৃহীত ও সমাজচ্যুত হয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করে, কেউ কেউ দেহ ব্যবসা এবং ভাসমান জীবনযাপনের মতো ভয়ংকর ও বিপদগামী পথ চলা শুরু করে। এভাবেই একটি সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

৫. ভিক্ষাবৃত্তি

যৌতুক-লোভী ভিক্ষুকের উদর পূরণে ও তার জাহান্নামের ঝুড়ি ভরতে অনেক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পাত্রীপক্ষকেও বিত্তশালীদের কাছে হাত পাততে হয়।

ইজ্জত-সম্মান, মানমর্যাদা সব কিছু পেছনে ঠেলে, যা কখনো কল্পনা করেনি, তাও তাকে করতে হয় যৌতুক-লোভী হায়েনাকে খুশি করার জন্য। উদ্দেশ্য, নিজের কন্যার ভবিষ্যৎ। তবুও কি তাদের হিংস্রতা থেকে মেয়ে নিঃস্কৃতি পায়? পায় না।

৬. মৃত্যুর পরোয়ানা

অনেক মেয়ের জীবনে যৌতুক মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে হাজির হয়। দৈনিক খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায়, যৌতুকের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে মেয়ের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন নির্যাতন। ফলে তার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। কেরোসিন ঢেলে শরীরে আগুন, উত্তপ্ত শাবল, লোহা, ছেনা ইত্যাদি দ্বারা শরীর দগ্ধ করা, এসিড নিক্ষেপ করে মুখাবয়ব ও শরীর ঝলসে দেওয়া। শ্বাসরোধে হত্যা করা। পিটিয়ে পুরো শরীর রক্তাক্ত করা। অভিনব পদ্ধতিতে আরো অনেক লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনী স্থান পায় খবরের কাগজগুলোয়। কোনো কোনো সময় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সইতে না পেরে মেয়ে নিজেই বেছে নেয় বিভিন্ন উপায়ে আত্মহত্যার পথ।

৭. কন্যা হত্যা

পার্শ্ববর্তী দেশে মাতৃগর্ভে কন্যা হত্যার প্রবণতা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। মেডিকেল পরীক্ষায় গর্ভের বাচ্চা কন্যা প্রমাণিত হলে আর দেরি নেই সাথে সাথে মাতৃগর্ভ থেকে অপসারণ করে তার জীবনাবসান ঘটানো হয়। এসব কিছুই করা হয় যৌতুকের ভয়ে। এটা তাদের নিকট সময়ের আগেই সাবধানী পদক্ষেপ। হাদারাম হলে পদক্ষেপ এমনই হয়। আল্লাহতে যাদের বিশ্বাস নেই, তারা কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করেছে। মাতৃগর্ভে কন্যাসন্তান হত্যা করা মূলত ওই প্রথার পটভূমি তৈরি করা, ইসলাম যে প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেছে। নিষ্ঠুর এই বর্বরতাকে পুনরায় চালু করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছে অভিশপ্ত এই যৌতুক।

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে বর্বরোচিত এ কাজটি এখন পর্যন্ত কেউ করেছে কি না, জানা নেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন।

ফাতেমী যৌতুক একটি অবান্তর দলিল :

আশ্চর্য কথা! দ্বীন ধর্মের প্রতি যাদের একটু একটু টান রয়েছে, তারা বলে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিবাহে নাকি কিছু যৌতুক দিয়েছেন? বাস্তবতা হলো, এ ধরনের কথা তারা বুঝের অভাবে বলে থাকেন। ঘটনা হলো, হযরত আলী (রা.) তার পিতা আবু তালেবের মৃত্যুর পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্বে ছিলেন। অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালনার্থে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আলী (রা.)-কে কিছু সাংসারিক জিনিস প্রদান করেন। অনেক ওলামায়ে কেরামের মতে তা হযরত আলী (রা.)-এর লৌহবর্ম বিক্রয়ের টাকা দ্বারা ক্রয় করে দেন। সুতরাং এ ধারণা ঠিক নয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত ফাতেমা (রা.)-কে যৌতুকস্বরূপ কিছু দিয়েছেন। যদি এমনটি ধরা হয় তাহলে প্রশ্ন আসবে, তিনি অন্যান্য মেয়েকে কেন কিছু দান করেননি? অথচ তিনি একজন আদর্শ পিতা? এটা কি মূলত পরোক্ষভাবে কন্যাদের মাঝে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বৈষম্যের তীর নিক্ষেপ করা নয়? নাউজুবিল্লাহ্!

বার. হানিমুন

বিবাহের পর নব দম্পতির হানিমুনের নামে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর মতো নির্লজ্জতাও বর্তমান সমাজকে গ্রাস করে নিচ্ছে। এটা তো মূলত ওই জাতির কালচার, যারা নিয়মতান্ত্রিক বিবাহের পূর্বেই কয়েকজন সন্তানের জনক-জননীতে পরিণত হয়।

হানিমুনের জন্য সাধারণত নগ্ন পরিবেশ ও অশ্লীল সব স্পটকেই বেছে নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমান পরিবার ও অভিভাবকদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আরে ভাই! আকল থাকলে হানিমুনের টাকা দিয়ে নব দম্পতি একটি পুণ্যময় কাজও করে নিতে পারে। কাজটি হলো, (পরিপূর্ণভাবে শরয়ী বিধান মেনে) ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা আর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় গমন, যেখানে নেক সন্তান, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পারিবারিক সুখ-শান্তির জন্য মন ভরে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে পারবে। আল্লাহ তাআ'লা আমাদের সকলকে সুন্নত মোতাবেক বিবাহ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করুন। আমীন!!!

(সমাপ্ত)

বিভ্রান্তি ও নিরসন-৭

ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করার শরয়ী বিধান

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

ইসলামের যে সকল বিষয়সূত্র পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং উম্মতের একটি অংশ প্রত্যেক যুগে অবিচ্ছিন্নভাবে আমলের ধারা চালু রেখেছে, তার একটি হলো দুআতে ওয়াসিলা ধরা, মাধ্যম গ্রহণ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। বিষয়টি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবাদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। হ্যাঁ মালিকী, হাম্বলী, শাফিঈ এমনকি মুতাআখখিরীন হানাফিয়্যাহও শরীয়তের দৃষ্টিতে তাওয়াস্সুল বা ওয়াসিলা ধরাকে বৈধ বলেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ওয়াসীলা গ্রহণকারীর প্রশংসা করেছেন। দেখুন-সূরা ইসরা আয়াত-৫৭

নিম্নে আলোচ্য বিষয়ের দলিলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো :

আভিধানিক অর্থে তাওয়াস্সুল বা ওয়াসীলা :

তাওয়াস্সুল অর্থ : তাকাররুব বা নৈকট্য লাভ। বলা হয়, অমুক ব্যক্তি আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে।

কারো মাধ্যমে দুআ করানোকেও তাওয়াস্সুল বা ওয়াসীলা বলে।

সূরা মায়েদার ৩৫ নং আয়াতে ওয়াসীলা শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়।

সূত্র : তাফসীরুল আলূসী-৬/১২৪

পরিভাষায় :

আল্লাহর গুণবাচক নাম বা কোনো নেক আমল কিংবা আল্লাহর কোনো নেক বান্দাকে দুআর মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানানো অর্থাৎ, এভাবে দুআ করা যে, আয় আল্লাহ! অমুক নেক আমল বা অমুক বান্দার ওয়াসীলায় আমার দুআ কবুল করুন। (সূত্র : তুহফাতুল কারী ৩/৩৩৭)

দু'আর মধ্যে মাধ্যম/ওয়াসীলা ধরার মৌলিকভাবে চারটি পদ্ধতি পাওয়া যায়।

١. التوسل باسماء الله تعالى و صفاته

আল্লাহর নাম ও গুণবাচক নামের দ্বারা ওয়াসীলা ধরা। অর্থাৎ, এভাবে দুআ করা যে,

اسألك بكل اسم سميت به نفسك

সমস্ত ফুকাহা এ পদ্ধতিটিকে জায়েয বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'আল্লাহ তা'আলার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকো (প্রার্থনা করো)।' (সূরা আ'রাফ- ১৮০)

আরও দেখুন : মুসনাদে আহমাদ ১/১৯৩

٢. التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة

দুআর মধ্যে ঈমান ও নেক আমলের ওয়াসীলা ধরা। অর্থাৎ: এভাবে দুআ করা : আমার অমুক নেক আমলের ওয়াসীলায় আমার দুআ কবুল করো। তাওয়াস্সুলের এ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার ব্যাপারেও সমস্ত উলামা, ফুক্বাহা ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

কোনো কোনো মুফাসসিরীনের মতে, কুরআনের সূরা মায়েদা-৩৫, সূরা ইসরা-৫৭ নং আয়াতে ব্যবহৃত ওয়াসীলা শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিন ব্যক্তির পাহাড়ের গর্তে আটকে পড়ার ঘটনাসম্বলিত হাদীসটিও নেক আমলের মাধ্যমে ওয়াসীলা ধরার দলিল। বুখারীতে ইবনে উমর (রাযি.) থেকে হাদীসটি পাঁচ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে- হাদীস নং ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ২৪৬৫, ৫৯৭৪, মুসলিম-২৭৪৩

٣. التوسل بالنبى او الصلحاء فى الحيوة الدنيا.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াসীলা ধরা বা আল্লাহর নেক বান্দাদের জীবদ্দশায় তাদের ওয়াসীলা ধরা।

অর্থাৎ : 'তাদের মাধ্যমে দুআ করানো বা তাদের ওয়াসীলায় দুআ করা' উভয় সূরতই বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কোনো মতবিরোধ নেই।

তাওয়াস্সুলের এ পদ্ধতি তাওয়াতুর বা 'প্রত্যেক নির্ভরযোগ্য সূত্রে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত' দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

তদ্রূপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান ও

মুহাববত এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি মুহাব্বতের ওয়াসীলা ধরে দুআ করাও উলামায়ে কেরামের নিকট জায়েয। অর্থাৎ এভাবে দুআ করা : আর اسـألك بنبيك مـحـمد উদ্দেশ্য নেওয়া اسـألك بـإيـمـانى به وبمحبته

এ ক্ষেত্রে সলফের কোনো মতভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)ও এ পদ্ধতিকে বৈধ বলেছেন।

দলিলের জন্য দেখুন-সূরা নিসা-৬৪, তিরমিযী-৩৫৭৮, বুখারী শরীফ-১০১০

٤. التوسل بالنبى ا والصلحاء بذاتهم بعد وفاتهم

ইন্তিকালের পর নবী (আ.) অথবা নেকবান্দাদের সত্তার ওয়াসীলা গ্রহণ করা। অর্থাৎ এভাবে দুআ করা যে,

اللـهـم إنـى أسـألك بنبيك او بجـاه نبيك او بحق نبيك .

এবং তাদের সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা। তাওয়াস্সুলের এ পদ্ধতির ব্যাপারে অধিকাংশ ফুকাহা অর্থাৎ : মালিকী, শাফিঈ, হাম্বলী এবং মুতাআখখিরীনে হানাফিয়্যাহগণের অভিমত হলো, এভাবে তাওয়াস্সুল জায়েয যেভাবে জীবিত অবস্থায়ও জায়েয। (সূত্র : শরহুল মাওয়াহীব-১২/১৯৪, আল মাজমূ'-৮/২৭৪,আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া-১/২৬৬, ফাতহুল কাদীর-৮/৪৯৮, ইবনে আবিদীন-৬/৩৯৭)

শেষোক্ত তাওয়াস্সুলের ব্যাপারে যেহেতু সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইয়েরা মতভেদ করে থাকে, তাই বিষয়টি সামান্য বিশ্লেষণের সাথে তুলে ধরা হলো-

জমহুরে উলামায়ে কেরাম যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে এটাকে জায়েয বলেন :

يـا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ...

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য ওয়াসীলা সন্ধান করো।' (সূরা মায়িদা : ৩৫)

বর্ণিত আয়াতে ওয়াসীলা দ্বারা التوسل بـالـذات والأعـمال অর্থাৎ সত্তা এবং আমল উভয়টার ওয়াসীলা উদ্দেশ্য, কারণ "ওয়াসীলা" অর্থগতভাবে উভয়টাকে ধারণ করে। ফাতহুল বারীর বর্ণনা দ্বারাও এ কথা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, وسيـلة শব্দটি সত্তার মাধ্যমে ওয়াসীলা ধরে দুআ করাও বোঝায়।

আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বুখারীর ১০১ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, অন্য বর্ণনাতে الـلـهـم إنـا كـنـا نتـوسـل إليك بـنبيـنـا فتسقينا হে) আল্লাহ আমরা আপনার কাছে নবী (সা.)-এর ওয়াসীলা ধরে দুআ করতাম। আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করতেন...) এর সাথে اتخذوه وسيلة إلـى الـلـه এ অংশও আছে। অর্থাৎ আব্বাস (রাযি.)-কে তোমরা আল্লাহর নৈকট্যের ওয়াসীলা বা মাধ্যম বানাও। সুতরাং উক্ত হাদীসের প্রথম অংশে وسيـــلة দুআ চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হলেও اتـخذوه وسيلة অংশে সত্তার ওয়াসীলা গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মধ্যেও ওয়াসীলা শব্দটি উভয় অর্থকে শামিল করেছে, যা বর্ণিত ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সূত্র : ফাতহুল বারী- ৬/১১

وكـانـوا مـن قبـل يستـفتحون على الذين كفروا.

'যদিও পূর্বে এরা কাফেরদের (অর্থাৎ পৌত্তলিকদের) বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিজয় প্রার্থনা করত' (সূরা বাক্বারা : ৮৯)

এ আয়াতের তাফসীরে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন : ইয়াহুদীদের যখন কোনো বিষয় কঠিন হয়ে দাঁড়াত তারা দুআ করত :

اللهم انصرنا بالنبى المبعوث فى أخر الزمان الذى نجد صفاته فى التوراة.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! শেষ যমানায় প্রেরিতব্য নবীর ওয়াসীলায় আমাদের সাহায্য করো, যার গুণাবলি আমরা তাওরাতে পেয়েছি। সুতরাং তাদের দু'আ কবুল করা হতো। এখানে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়াতে আসার পূর্বেই তার ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা হতো এবং তা কবুল করা হতো।

কুরআনে তাদের এ কর্মের সমালোচনা ছাড়াই বলা হয়েছে সুতরাং এ আয়াত তাওয়াস্সুলের স্পষ্ট দলিল বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

الـلـهـم إنـا كـنـا نتـوسـل إليك بنبينا فتسقينا الخ

বুখারী শরীফ-হা. নং ১০১০

আরবী ব্যাকরণিক দিক থেকে كـنـا শব্দটি একটি চলমান কাজকে বোঝায়। সুতরাং এ হাদীসে উল্লেখ

আছে যে, উমর (রাযি.) বলেন : 'হে আল্লাহ! আমরা নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করতাম আপনি কবুল করতেন...'

অতএব আরবী ব্যাকরণিক দিক থেকে হাদীসটি এ অর্থ বোঝাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরাম নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর খলীফা ছিলেন আবু বকর (রাযি.), তারপর উমর (রাযি.), উমর (রাযি.)-এর খেলাফত পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা হতো, হাদীসটি এ কথাই বোঝাচ্ছে, সুতরাং 'ওয়াসীলা ধরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশার সাথে সীমিত' এমন কোনো কথা বর্ণিত হাদীসটিতে নেই। তবে আহলে হাদীস বন্ধুরা দাবি করে থাকে যে, "উক্ত হাদীসে আব্বাস (রাযি.)-এর ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা হয়েছে, কারণ তিনি জীবিত ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা হয়নি, যেহেতু তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল," কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট বুঝে আসবে যে, উক্ত বর্ণনায় সূক্ষ্মভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা হয়েছে। দুআর শব্দটি ছিল :

اللهم إنا نتوسل بعم نبينا .....ألخ

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচার ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, হাদীসের শব্দটি এখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'ক্বারাবাত' বা আত্মীয়তা সম্পর্কের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা বোঝাচ্ছে, দুআর মধ্যে এ কথা বলা হয়নি যে, আববাস (রাযি.)-এর ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি বরং বলা হয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচার ওয়াসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আত্মীয়তা সম্পর্কের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করার অর্থই হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা। সুতরাং এখানে তাঁর মৃত্যুর পর ওয়াসীলা দেওয়া নিষেধ, এমন কোনো প্রমাণ নেই, বরং এটা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীস সামনে পেশ করা হলো :

حديث مالك الدار :أصاب الناس قحط فى زمان عمر بن الخطاب رضـ ، فجاء رجل إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله! استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا...ألخ

أخرجه البيهقى و بطريقه أخرجه التقى السبكى فى شفاء السقاح

وأخرجه البخارى فى تاريخه بطريق أبى صالح ذكوان، وأخرجه ابن خيثمة، أخرجه أيضا ابن أبى شيبة باسناد صحيح كما نص عليه ابن حج

'মালেক আদ্দার (রাযি.) থেকে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)-এর খেলাফতকালে বৃষ্টি-খরার শিকার হয়েছিল। এক ব্যক্তি নবীজি (সা.)-এর কবরের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার কাছে উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন তারা তো বৃষ্টি-খরায় ধবংস হয়ে যাচ্ছে...।' (ফাতহুল বারী : ২/৬১১)

হাদীস বিশারদদের ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে তাঁর ইন্তিকালের পর বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনাকারী ছিল বিলাল ইবনে হারেস, কোনো সাহাবী থেকে এর বিরোধিতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সুতরাং তাওয়াস্সুলের এ পদ্ধতিকে অস্বীকার করা কুরআন-হাদীস অস্বীকার করার নামান্তর।

৫. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধরনের তাওয়াস্সুলের শিক্ষা দিয়েছেন।

এরপর সাহাবায়ে কেরাম তার পরবর্তীদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর তাওয়াস্সুল গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছেন।

عن عثمان بن حنيف :أن رجلا ضريرالبصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال :ادع الله أن يعافنى .....فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوء ه ويدعوا بهذا الدعاء :اللهم إنى أسئلك و اتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى .....أخرجه الترمذى ٣٥٧٨-

وقال :هذا حديث حسن غريب. أخرجه البخارى فى تاريخه الكبير و ابن ماجه فى صلاة الحاجة والنسائى فى عمل اليوم والليلة، وأبو نعيم فى معرفة الصحابة والبيهقى فى دلائل النبوة و غيرهم على اختلاف يسير فى غير موضع الاستشهاد ,وصححه جماعة من الحفاظ يقارب عددهم خمسة عشر حافظا فمنهم سوى المتأخرين الترمذى وابن حبان والحاكم والطبرى وابونعيم والبيهقى والمنذرى

'উসমান ইবনে হুনাইফ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, চক্ষুরোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, আমার সুস্থতার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করুন... সুতরাং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সুন্দরভাবে উযূ করতে বললেন এবং এই দুআটি পড়তে বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং রহমতের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াসীলায় আপনার প্রতি ধাবিত হচ্ছি...(তিরমিযী হা. নং ৩৫৭৮)

বর্ণিত হাদীসে অনুপস্থিতির সম্বোধন/গায়েবানা সম্বোধনের সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সত্তার ওয়াসীলা দিয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং দুআ করা শিক্ষা দিয়েছেন, যা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশার সাথে খাস না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

বরং হাদীসের বর্ণনাকারী উসমান ইবনে হুনাইফও উক্ত হাদীসের এই অর্থই বুঝেছেন যে, ওয়াসীলা ধরা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশার সাথে খাস নয়। তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁর সত্তার ওয়াসীলা গ্রহণ করা যাবে। তবরানী শরীফে আছে,

ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان رضى الله عنه فى زمن خلافته ,فكان لايلتفت ولا ينظر اليه فى حاجته فشكا ذالك لعثمان بن حنيف ,فقال له :ائت الميضأة فتوضأ ...ثم قل :اللهم انى اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة ,يامحمد انى اتوجه بك الى الله فيقضى لى حاجتى ....فقال ابن حنيف ,والله ما كلمته ولكن ما شهدت رسول الله الخ

اخرجه الطبرانى فى معجم الصغير ١/١٨٣ والبيهقى من طريقين واسنادهما صحيح ,والهيثمى فى مجمع الزوائد واقره عليه كما اقر المنذرى قبله فى الترغيب

'উসমান ইবনে আফফান (রাযি.)-এর খেলাফত যুগে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে একটি প্রয়োজনে বার বার যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি কোনো কারণবশত তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করছিলেন না এবং তার প্রয়োজনও পুরা করছিলেন না। তাই সে উসমান ইবনে হুনাইফের কাছে শেকায়াত করল। উসমান ইবনে হুনাইফ তাকে বললেন, ভালোভাবে উযূ করো... অতপর এই বলে দুআ করো, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং রহমতের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াসীলায় আপনার দিকে ধাবিত হচ্ছি...

(তবরানী সগীর : ১/১৮৩)

প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ আহলে হাদীস আলেম আল্লামা মুবারাকপুরী লিখেছেন : শায়েখ আব্দুল গনি 'ইনজাহুল হাজাহ' কিতাবে শায়েখ আবেদ সিন্ধির সূত্রে লিখেছেন যে, হাদীসুল আ'মা (অর্থাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিখানো ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করার হাদীসটি) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্তার মাধ্যমে তাওয়াস্সুল জায়েয হওয়া বোঝায় এবং উসমান বিন হুনাইফের তালীমের হাদীসটি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর সত্তার তাওয়াস্সুল জায়েয হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে।

আল্লামা শাওকানী তুহফাতুয যাকেরীনে বলেছেন, উসমান ইবনে হানীফের তা'লীমের হাদীসটি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্তার মাধ্যমে তাওয়াস্সুল জায়েয হওয়ার ওপর দলিল। শর্ত হলো, এ বিশ্বাস রেখে দুআ করতে হবে যে, করণেওয়ালা যাত আল্লাহ তা'আলা। (তুহফাতুল আহওয়াযী : ১০/২৭)

৬. স্বয়ং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করেছেন। যারা দুনিয়া থেকে অনেক পূর্বেই ইন্তিকাল

করে গেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

اغفر لأمى فاطمة بنت اسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى فإنك ارحم الراحمين .اخرجه الطبرانى فى الكبيروالاوسط كما فيجمع الزوائد للهيثمى

'আমার মা ফাতেমা বিনতে আসাদের মাগফেরাত করো এবং আপনার নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আমার পূর্বে গত নবীগণের ওয়াসীলায় তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন'

(মাজমাউযযাওয়ায়েদ : ৯/২৫৭)

৭. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আম্বিয়া (আ.)-এর ইন্তিকালের পর তাদের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার বিষয়টি পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন আমরা পাঠক সমাজের সামনে অন্যান্যদের ওয়াসীলায় দু'আ করার একটি দলিল পেশ করছি।

وفى سنن ابن ماجه فى باب المشى إلى الصلاة عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه :من خرج من بيته إلى الصلاة فقال إنى أسألك بحق السائلين عليك....

قال الشيخ زاهد الكوثرى :لاتنزل درجة الحديث مهما نزلت عن درجة الاحتجاج به بل يدور أمره بين الصحة والحسن لكثرة المتابعات والشواهد كماأشرنا إليها, وقد حسن هذا الحديث الحافظان العراقى فى تخريج الأحياء وابن حجر فى أمالى الأذكار.

'যে ব্যক্তি নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয় অতপর বলে, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার কাছে প্রার্থনাকারীদের ওয়াসীলায়...'

বর্ণিত হাদীসটি সাধারণ এবং বিশেষ সব ধরনের লোকের ওয়াসীলা গ্রহণের বৈধতার প্রমাণ বহন করে।

বি.দ্র. ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) মাজমূআতুল ফাতাওয়াতে তিন ধরনের তাওয়াস্সুলের আলোচনা করেছেন।

التوسل بالإيمان به وبطاعته

'নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান এবং তাঁর আনুগত্যের ওয়াসীলা দিয়ে দুআ করা।'

'তাওয়াসসুল অর্থাৎ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে দুআ এবং শাফায়াত প্রার্থনা করা

التوسل بمعنى دعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم

এই দুই প্রকারের ব্যাপারে বলেছেন, উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে উভয় প্রকার জায়েয।

التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته صلى الله عليه وسلم

'তাওয়াস্সুল অর্থাৎ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্তার কসম দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করা।' (মাজমুআতুল ফাতাওয়া : ১/১০৬)

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেছেন, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) যে তাওয়াস্সুলকে নাজায়েয বলেছেন, সেটা হলো :

التوسل بمعنى الأقسام على الله بغير أسمائه

'তাওয়াস্সুল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নামে কসম দিয়ে দুআ করা।'

আর এ প্রকারের তাওয়াস্সুলকে আমরাও নাজায়েয বলি।

কিন্তু তাওয়াস্সুল যদি উক্ত পদ্ধতিতে না হয় তাহলে সেটা জায়েয হবে। ফায়যুল বারী : ৩/১০৫

উল্লেখ্য, কেউ যদি এ বিশ্বাস নিয়ে দুআ করে যে, 'আমার মতো গুনাহগারের আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার যোগ্যতা কোথায়, তাই আমরা আল্লাহর নেক বান্দাদের কাছে চাই।' (মাজারপুজারী, বিদআতী সম্প্রদায় যেটা করে থাকে) তাওয়াস্সুলের এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হারাম।

তদ্রূপ কোনো বুযুর্গের কবরে গিয়ে তার কাছে অনুরোধ করো যে, 'সে যেন তার জন্য আল্লাহর কাছে তার কোনো প্রয়োজন পূরণের দুআ করে।' তাওয়াস্সুলের এ পদ্ধতিটিও নাজায়েয। (ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম : পৃ. ৪৯-৬০)

আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন- ফাতহুল বারী : ২/৬১০, তুহফাতুল কারী : ৩/৩৩৭-৩৩৯, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৫/৩১৬-৩১৯, ফয়যুল বারী : ৩/১০৫, তুহফাতুল আহওয়াযী : ১০/২৫-৩১, মাকালাতুল কাওসারী : ৩৩৯-৩৫৬, মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ : ১৪/১৪৯-১৬৪)

দেওবন্দিয়ত শতাব্দীর একটি 'তাজদীদি' চিন্তা-চেতনার নাম

মুফতী আবুল কাসেম নূমানী

(বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রোজ বৃহস্পতিবার মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকাতে তাশরীফ আনেন বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত মুহতামিম প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন পীরে কামেল আমীরুল হিন্দ হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নূমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)। মারকাযের আসাতিযা-তলাবাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন তিনি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সে নসীহত আল-আবরারের পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো।)

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ـ اما بعد:

قال النبى ﷺ ان الله لا يرفع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذالناس رؤسا جهالا فسئلو فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا (الصحيح البخارى ١/١٠٠)

وقال النبى ﷺ عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامة رأس كل مأة سنة من يجدد بها دينها (ابو داؤد ٤/٤٨٠)

وقال النبى ﷺ يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تاويل الجاهلين وانتحال المبطلين (بيهقى ١٠/٢١٠)

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম, আযীয তালাবা! আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা দরকার, তিনি আপনাদেরকে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য এই মারকাযে একত্রিত করেছেন। ইলমে দ্বীন আল্লাহ তা'আলার বিশাল একটি নিয়ামত, যা কোনো মানুষকে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহেই দান করে থাকেন। কেউ চাইলেই তা অর্জন করতে পারে না। অনেক মা-বাবার ইচ্ছা থাকে তার সন্তান আলেম হোক, হাফেজ হোক। কিন্তু হয় না। তাই যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইলম অর্জন করার তাওফীক দিয়েছেন তাদেরকে এ জন্য খুব বেশি বেশি আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে।

সাথে সাথে আপনাদের এই জন্যও শোকর আদায় করতে হবে যে, হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারকাতুহুম)-এর মতো বিজ্ঞ বুজুর্গ ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে ইলম অর্জনের সুযোগ লাভ করেছেন। পাশাপাশি এই মহান বুজুর্গ থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমি আপনাদের সামনে নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তিনটি হাদীস পাঠ করেছি। তার আলোকে সংক্ষেপে কিছু কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করব।

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন ان الله لايرفع هذا العلم ـــ الخ

বান্দাদের হৃদয় থেকে ইলম ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন না। বরং উলামাদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন। অবশেষে যখন একজন আলিমকেও বাকি রাখবেন না, তখন মানুষ মূর্খকে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করবে। এবং তাদের প্রতি কৃত প্রশ্নের জবাবে অজ্ঞতাবশত ফতওয়া দেবে, এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে। অপরকেও বিপথগামী করবে। (বুখারী শরীফ)

উক্ত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যা কিয়ামত এর আলামতের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। কেননা কিয়ামতের অনেক নিদর্শনাবলি আছে, যথা ব্যভিচার বেড়ে যাওয়া, অশ্লীলতায় সয়লাব হওয়া, সুদি লেনদেন বেড়ে যাওয়া, ইলম উঠিয়ে নেওয়া ইত্যাদি। ইলম উঠিয়ে নেওয়া অর্থ এমন হবে না যে, রূহ যেমন হঠাৎ করে ভেতর থেকে বের করা হয়, ইলমকেও টেনে বের করে উঠিয়ে নেওয়া হবে। বরং অবস্থা হবে ইলমের বাহক আলেমকে ধীরে ধীরে উঠিয়ে নেওয়া হবে। যখন একজন চলে যাবে তার স্থলাভিষিক্ত কেউ হবে না। এভাবে ক্রমান্বয়ে ইলম হ্রাস পেতে থাকবে। ইলমে হাকীকী এর আলেম একসময় আর থাকবে না। তখন মানুষ বিপাকে পড়ে অজ্ঞ লোকদের কাছে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। জানতে চাইবে। জনসাধারণ তখন লম্বা জামা পরিহিত ও দাড়ি-টুপিওয়ালা কাউকে দেখলেই বড় আলেম মনে করে ধর্মীয় বিষয়

জানতে চাইবে, প্রশ্ন করবে। আর তারাও মান-ইজ্জত রক্ষার্থে নিজেদের স্বার্থে অজানা বিষয়েও ফায়সালা দেবে। এতে তারা নিজেরা তো গোমরাহ হবেই অন্যকেও বিপথগামী করবে। মূলত ওই সময়টিই হবে شرار الناس তথা অজ্ঞ জাহেলদের একচ্ছত্র আধিপত্যের সময়। আর তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। কেননা হাদীসে আছে কিয়ামত সংঘটিত হবে জাহেলদের ওপর। তাই আমাদের লক্ষ রাখতে হবে, আমরা যেন ইলম দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার কারণ না হই। আর তার পদ্ধতি হলো, ইলম অর্জন করার পর ইলমের খেদমতে নিয়োজিত হওয়া। অন্য কোনো চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা অন্তরে না আনা।

২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন– ان الله يبعث لهذه الامة على رأس-- الخ অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই উম্মতের প্রতিটি শতাব্দীতে একজন করে মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন। যিনি উম্মতের ধর্মীয় বিষয় সংস্কার করবেন। আমাদেরকে মুজাদ্দিদ ও তাজদীদের মর্মার্থ বুঝতে হবে। তাজদীদের আসল অর্থ হলো কোনো জিনিস নষ্ট, পুরাতন ও অচল হয়ে গেলে সেটাকে সংস্কার করা, পরিষ্কার করা এবং সচল করে তোলা। সুতরাং ধর্মের ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদ ওই ব্যক্তি হবেন, যিনি ধর্মীয় বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কুসংস্কারকে দূরীভূত করে মানবসমাজে সঠিক দ্বীনের প্রচার করবে। আর এ কথাটিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য হাদীসে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

৩.

يرث هذا العلم من كل خلف عدوله --- الخ

ন্যায়পরায়ণ প্রতিটি উত্তরসূরিই পূর্বসূরিদের কাছ থেকে ইলমে দ্বীনের ধারক হয়ে অতিরঞ্জিতকারীদের অতিরঞ্জন ও বাতিলপন্থীদের মিথ্যা এবং জাহিলদের অপব্যাখ্যা থেকে এই দ্বীনকে রক্ষা করবেন।

এ হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) خلف শব্দ বলেছেন। خلف হলো পরবর্তীতে যারা আসছে তারা। আর سلف হলো এর বিপরীত তথা পূর্বসূরি। সুতরাং বোঝা গেল উত্তরসূরিদের মাঝেও এমন লোক হবেন, যারা ধর্মীয় বড় বড় কাজ করবেন।

পূর্ব যুগে তো ব্যক্তিবিশেষই মুজাদ্দিদ হতেন। যেমন একসময় ছিলেন ইমাম গজালী (রহ.), মুজাদ্দিদে আলফে ছানী প্রমুখ। কিন্তু একপর্যায়ে তাতে ব্যাপকতা চলে আসে। যেমন বর্তমান সময়। বর্তমানে কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মুজাদ্দিদ না বানিয়ে পুরো একটি দলকে মুজাদ্দিদ হিসেবে মনোনীত করেছেন। আর তাঁরা হলেন উলামায়ে দেওবন্দ। এই দলের একেকজন ব্যক্তি দ্বীনের একেকটি শাখায় ব্যাপক সংস্কার করেছেন।

এ কথার সমর্থনে আমার উস্তাদ শায়খুল মাকূলাত ওয়াল মনকুলাত মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী (রহ.)-এর একটি মন্তব্য পেশ করছি। তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম من يجدد دينها এই হাদীস সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। তাই এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা পুরো একটি দলকে মুজাদ্দিদ হিসেবে মনোনীত করবেন। উলামায়ে দেওবন্দের থেকে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ইসলাম স্বীকৃত তাসাউফ বিষয়ে ব্যাপক সংস্কারমূলক কাজ করেছেন। দ্বীনের এই শাখাতে বাতিলপন্থী কর্তৃক যত ধরনের ভেজাল মিশ্রণ করা হয়েছিল, তা তিনি দূর করেছেন। হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসে ব্যাপক সংস্কারমূলক কাজ করেছেন। এভাবে ইলমে আকাঈদে ব্যাপক সংস্কারমূলক কাজ করেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসেম নানুতবী (রহ.)। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা একটি বিষয় নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অন্যদিকে মনোনিবেশই করেননি। বরং তাঁরা চতুর্মুখী মেহনত করেছেন। সকলের উদ্দেশ্য ও মাকসাদ ছিল এক ও অভিন্ন। আর তাহলো ভ্রান্ত দলগুলো যেমন–কাদিয়ানী, গাইরে মুকাল্লিদ, শিয়া, রাফেজী, মওদুদী, বেরলভী ইত্যাদি কর্তৃক ইসলামের মধ্যে যে সংযোজন-বিয়োজনের স্টিমরোলার চালানো হয়েছে তা থেকে দ্বীনকে রক্ষা করা এবং মানবজাতির সামনে দ্বীনের সঠিক অবস্থান তুলে ধরা।

বড় আশ্চর্যের বিষয়, যারা বাতিল ও ভ্রান্ত দল তাদের পরস্পরের মাঝে কোনো মতবিরোধ থাকে না। সাধারণত তা দেখাও যায় না। আপনারাও হয়তো দেখেননি। যেমন শিয়ারা মওদুদীদের বিরোধী নয়, মাজার পন্থীরা বেরলভীদের বিরোধী নয়, আহলে হাদীসরা মওদুদীদের বিরোধী নয়, কাদিয়ানীরা বেরলভীদের বিরোধী নয়। এভাবে সকল বাতিলদের পরস্পরে কোনো বিরোধ নেই। আর দেওবন্দিয়াত অর্থ হলো, সকল প্রকার বাতিলের মোকাবিলা করা। তাদের ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করে মুসলমানদের মাঝে সঠিক ও প্রকৃত ইসলাম প্রচার করা। কারণ তারা তাজদীদি দল। এ কারণে সকল বাতিলরা হামেশা হামলা করেই চলছে দেওবন্দীদের উপর। এটি দেওবন্দিয়াতের হক হওয়ার একটি

দলিলও।

দেওবন্দী শুধু তারাই নয়, যারা কেবল দেওবন্দে পড়ালেখা করেছে। বরং প্রত্যেক ওই ব্যক্তি দেওবন্দী যারা, দেওবন্দী মসলক গ্রহণ করেছে এবং তদানুযায়ী আমল করে থাকে। চাই তারা ভারতে হোক বা পাকিস্তানে, বাংলাদেশে হোক বা বার্মায়। আমেরিকায় হোক বা ইউরোপে।

এ অর্থে বিশ্বের সর্বস্থানে দ্বীনের যে সঠিক খেদমত চলে আসছে তা ওলামায়ে দেওবন্দের অবদান। এটা শুধু দাবি নয় বরং বিভিন্ন দেশের মনীষীরা তা স্বীকার করেছেন। সপ্তাহ খানিক আগে দারুল উলুম দেওবন্দ সফর করেন সৌদি সরকারের ধর্মমন্ত্রী। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, বিশ্বের যত জায়গায় যাওয়া হয়েছে সবখানে খালেস দ্বীনি কাজে দারুল উলূম দেওবন্দের সন্তানদেরকে দেখতে পেয়েছি। পবিত্র হারামাইনের ইমামগণ বিশেষ করে শায়খ সুবাইল (রহ.), শায়খ আব্দুর রহমান আসসুদাইস এবং শায়খ শুরাইম প্রমুখ দারুল উলূম দেওবন্দ সফরকালে একই কথা ব্যক্ত করেছেন।

যাই হোক, মূল কাজ হলো আমরা যে ইলম শিখছি, এটা আমাদের নিকট আমানত। এই আমানত জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে হবে। এজন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো, নিজের জীবনকে উক্ত ইলম মোতাবেক ঢেলে সাজাতে হবে। এরপর এটাকে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। যে বিষয়ই হোক জানার সাথে সাথে পূর্ণ আমল করাও জরুরি। আর এ ব্যাপারেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

فلولا نفر من كل فرقة منهم ---

"কেন তোমাদের থেকে একটি দল বের হয় না, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন করবে ও তারা যখন জাতির নিকট ফিরে আসবে তাদেরকে বিভিন্ন ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করবে।"

আমাদের লক্ষ রাখতে হবে আমরা যেন এই আয়াতের ওপর আমল করতে পারি।

দ্বীন শিক্ষা করা, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরাতী নেজামেরই অংশ। আল্লাহ যখন যেভাবে চান, সেভাবে হয়। এমন নয় যে, এখানে মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব একটি ছোট মারকায করেছেন, পরে এটি এমনিতেই এত বড় হয়ে গেছে। বরং এটা আল্লাহ পাকের সে বিশেষ নেজামের অংশ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এর যথাযথ মূল্যায়ন করে এখান থেকে ইলম অর্জন করতে হবে, তদানুযায়ী আমল করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

অনুবাদ ও সংগ্রহ :

মুহাম্মদ জহীরুল ইসলাম মাদারীপুরী

লা-মাযহাবী ফিৎনা প্রতিরোধ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৪

লা-মাযহাবী-গাইরে মুকাল্লিদ... ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একটি ভয়ঙ্কর ফিৎনার নাম। এই ফিৎনার মোকাবেলা করতে হলে জানতে হবে তাদের উদ্ভট, বানোয়াট দাবী ও দলীলের দাঁতভাঙ্গা জবাব। এ লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উলামায়ে কেরাম, ইমাম সাহেবানদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স। এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন আকাবেরে দারুল উলূম দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত লা-মাযহাবী ফিৎনা প্রতিরোধ মিশনের অন্যতম সফল প্রশিক্ষক, লা-মাযহাবী ফিরকার আতংক, প্রখ্যাত হাদীস ও ফিক্বহ বিশারদ, মুনাযিরে আহলে সুন্নাত হযরত **মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ মা'সূম সাকিব মুরাদাবাদী কাসেমী,** ভারত।

প্রোগ্রাম সূচি

তারিখ	বার	আরম্ভ	স্থান	যোগাযোগ
২৪ মার্চ	সোমবার	সকাল ১০টা	জামিয়া ইসলামিয়া মাইজদী, নোয়াখালী।	০১৭১২৬৪৬৫৪০
২৫ মার্চ	মঙ্গলবার	বাদ আসর	জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর, চট্টগ্রাম।	০১৯১২০৬১৭০০
২৬ মার্চ	বুধবার	সকাল ৯টা	জামিয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া।	০১৭১৬৩৮৫৯৯৬
২৭, ২৮, ২৯ মার্চ	বৃহস্পতি, শুক্র, শনি	প্রত্যহ বাদ আসর	মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।	০১৮১৭৫৭৯৩৪৭

ব্যবস্থাপনায় : মজলিসে উলামায়ে আহলে সুন্নাত বাংলাদেশ

অস্থায়ী কার্যালয় : জামিয়া মাদানিয়া শুলকবহর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-২

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

মুদ্রা বিকাশের প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা :

১. প্রাচীন যুগে মানুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে পণ্যকে ব্যবহার করত। যাকে Barter system বলা হয়। কিন্তু এ পদ্ধতি অনেক জটিল হওয়ায় ক্রমে লোকজন এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে।

২. এরপর মানুষ নির্দিষ্ট পণ্য ও বস্তুকে বিনিময়ের মাধ্যম নির্ধারণ করে। যাকে Commodity money system বলা হয়। এ পদ্ধতিতে অধিক ব্যবহৃত পণ্যকেই বিনিময় মাধ্যম বানানো হতো। যেমন–গম, লবণ, চামড়া, লোহা ইত্যাদি।

৩. এ পদ্ধতিতে বহন জটিলতার কারণে লোকজন এর থেকেও ধীরে ধীরে বিমুখ হয়ে পড়ে। এমনিতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সর্বোপরি সহজার্থে মানুষ স্বর্ণ-রুপাকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। এমনকি উভয় ধাতু মূল্যের জন্য একটা মানদণ্ডের স্থান দখল করে নেয় এবং লোকজনও উভয়টির প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়ে। এ পদ্ধতিকে ধাতব মুদ্রাপদ্ধতি বা Metalic money system বলে। এই তৃতীয় পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়। যার সারমর্ম নিম্নরূপ-

প্রথম অবস্থাতে মানুষ এমন স্বর্ণ-রুপাকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করত, যা সাইজ, আয়তন, ওজন ও স্বচ্ছতার মধ্যে ভিন্ন হতো। কিছু স্বর্ণ টুকরা আকারে হতো। আর কিছু পাত্র ও অলংকার আকারে। কিন্তু বিনিময়ের সময় শুধু ওজনই মুখ্য হতো।

২. দ্বিতীয় ধাপে ঢালাইকৃত মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। কোথাও স্বর্ণের আর কোথাও রুপার, যা পরিমাণ, ওজন ও খাঁটি স্বর্ণ হিসেবে সমান্তরাল হতো এবং উভয় পিঠে মহর থাকত, যা এ কথার প্রমাণ বহন করত যে, এই মুদ্রা আসল ও আদান-প্রদানযোগ্য। এবং ওই মুদ্রার বাহ্যিক মূল্য (Face value) যা তার ওপর লিখিত থাকত তা ওই স্বর্ণ ও রুপার বাস্তব মূল্যের (Gold or silver contents) সমান হতো। মুদ্রার আকৃতিতে ঢালাইকৃত স্বর্ণের মূল্য মুদ্রার সমপরিমাণ চাকার সমতুল্য হতো। এ ব্যবস্থাপনাকে Gold specie standard বলে। এ পদ্ধতি সর্বপ্রথম চীনবাসী খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবিষ্কার করে। এ ব্যবস্থাপনায় লোকদের জন্য এ সুযোগ ছিল যে, তারা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রাও ব্যবহার করতে পারত। আবার স্বর্ণের টুকরা প্রলেপ দেওয়া স্বর্ণ ও অলংকারাদিও ব্যবহার করতে পারত। এবং বিদেশেও আমদানি-রপ্তানি করতে পারত এবং সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক অনুমতি ছিল যে, যে কেউ যে পরিমাণ মুদ্রা বানাতে চায়, বানাতে পারবে। সেই সুবাদে লোকজন সরকারের নিকট স্বর্ণের টুকরা এবং স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া অন্যান্য জিনিস আনলে সরকার সেগুলো মুদ্রা বানিয়ে ফেরত দিত এবং কেউ গলাইতে চাইলে সরকার সেগুলো গলিয়ে ফেরত দিত।

৩. কোনো কোনো দেশ এক ধাতুর পরিবর্তে উভয় ধাতুর মুদ্রার প্রচলন করে ছিল এবং উভয়টি পারস্পরিক লেনদেনের জন্য বিশেষ মূল্য নির্ধারিত ছিল। এবং স্বর্ণকে বড় মুদ্রা ও রুপাকে ছোট মুদ্রা হিসেবে গণনা করা হতো। এই পদ্ধতিকে দু'ধাতু পদ্ধতি বা Bi-metallism বলা হতো। কিন্তু বিভিন্ন শহরে উভয় ধাতব মুদ্রার নির্ধারিত মূল্য বিভিন্ন রকম হয়ে যাওয়াতে এই পদ্ধতিতে জটিলতা দেখা দেয়। যার কারণে লোকজন কারেন্সি ব্যবসার প্রতি উৎসুক হয়ে পড়ে যেমন- আমেরিকাতে একটি স্বর্ণের কড়ির মূল্য ১৫টি রুপার কড়ির সমান। পক্ষান্তরে ঠিক একই সময়ে ইউরোপে স্বর্ণের এক কড়ির মূল্য রুপার সাড়ে পনেরো কড়ির সমান। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীরা আমেরিকা থেকে স্বর্ণের কড়ি জমা করে ইউরোপে বিক্রি করত। অতঃপর তারা রুপার কড়ি আমেরিকায় নিয়ে স্বর্ণে রূপান্তর করে ইউরোপে বিক্রি করে রুপা নিয়ে আসত। এতে আমেরিকা থেকে ইউরোপে ধারাবাহিকভাবে স্বর্ণ স্থানান্তরিত হতে থাকে। অতঃপর ১৮৩৪ সালে আমেরিকা যখন স্বর্ণ-রুপার কড়ির মধ্যকার অনুপাত পরিবর্তন করে দেয় এবং স্বর্ণের এক কড়িকে রুপার ১৬ কড়ির সমান নির্ধারণ করে দেয়। তখন পরিস্থিতি প্রথম অবস্থার বিপরীত হয়ে যায়।

৪. মুদ্রা চাই স্বর্ণের হোক বা রুপার পণ্যের তুলনায় যদিও তা বহন করা সহজ, চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। তাই বিত্তবানদের জন্য ওই কড়িগুলো ঘরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তারা ওইগুলো স্বর্ণকার এবং Money changer-দের নিকট আমানতের ভিত্তিতে রাখা শুরু করে। এবং তারা আমানতকারীদেরকে দলিলস্বরূপ একটি রসিদ দিত। পরবর্তীতে একপর্যায়ে ওই রসিদগুলোই বিনিময় মূল্য হিসেবে ব্যবহার হতে থাকে।

ক্রমে ক্রেতারা দোকানদারকে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মুদ্রার পরিবর্তে রসিদ দিত। এবং অপরপক্ষও আস্থার ভিত্তিতে তা গ্রহণ করত। এ স্তর থেকে কাগুজে নোটের প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু কোনো আইনানুগ মর্যাদা এর ছিল না। যার ফলে এটার নির্ভরতা ছিল কেবল পারস্পরিক আস্থার ওপর।

৫. ১৭০০ সালের শুরুতে এ রসিদ সিস্টেম প্রচলন বেশি হওয়ার কারণে একপর্যায়ে সাংবিধানিক ধারা অনুসারে এগুলোকে ব্যাংক নোট হিসেবে নামকরণ করা হয়। সর্বপ্রথম সুইডেনের স্টকহোম ব্যাংক এ নোট সিস্টেম চালু করে। তখন নিয়ম ছিল সে ব্যাংকে এ পরিমাণ নোট ইস্যু করবে যে পরিমাণ স্বর্ণ তার নিকট থাকবে। এবং গ্রাহকের যেকোনো মুহূর্তে ব্যাংক থেকে নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ উত্তোলনের সুযোগ থাকবে। এ পদ্ধতিকে Gold bullion standard বলে।

৬. ১৮৩৩ সালে ব্যাংক নোটের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়ে যায়। তখন সরকার ব্যাংক নোট পদ্ধতিকে Legal tender ঘোষণা দেয় এবং প্রত্যেক ঋণগ্রহীতার ওপর বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয় যে, নিজের ঋণের পরিবর্তে ওই নোটও অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যেমনটা স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। পরবর্তীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ওপর নোট ইস্যু করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এবং শুধুমাত্র রাষ্ট্র পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ইস্যু করার অনুমতি দেওয়া হয়।

৭. অতঃপর উন্নয়নশীল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জটিলতার কারণে সরকার বিশাল অঙ্কের কাগুজে নোট ইস্যু করতে বাধ্য হয়। অতঃপর ইস্যুকৃত ব্যাংক নোটের বিপরীতে যে পরিমাণ স্বর্ণ ছিল, তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং উভয়টার সম্পর্ক কমতে কমতে একেবারে সাধারণ পর্যায়ে এসে ঠেকে। এই ধরনের ব্যাংক নোটকে Fiduciary money বা আস্থানির্ভর মুদ্রা বলা হয়। অপরদিকে আয়ের স্বল্পতা ও অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজনে ওই সব রাষ্ট্রগুলো যারা ধাতব মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন করে আসছিল তারাও বাধ্য হলো যে, হয়তো মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর পরিমাণ কমিয়ে দেবে অথবা প্রত্যেক ধাতব মুদ্রায় আসল ধাতুর পরিবর্তে নিম্নমানের ধাতু ব্যবহার করবে। যার ফলে মুদ্রার বাহ্যিক মূল্য Face value, যা মুদ্রার ওপর নির্ধারিত ছিল তা ওই মুদ্রার আসল মূল্যের কয়েকগুণ বৃদ্ধি হয়ে যায়। এ ধরনের মুদ্রাকে Token money বলা হয়।

৮. ধীরে ধীরে ধাতব সঞ্চিতের সমর্থনহীন মুদ্রার প্রচলন বেড়ে স্বর্ণের পরিমাণের কয়েকগুণ হয়ে গেল। ফলে রাষ্ট্রের সামনে খুব কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। স্বর্ণের বর্তমান রিজার্ভ দ্বারা ওই ব্যাংক নোটগুলোকে স্বর্ণে পরিবর্তনের চাহিদা পূরণ রাষ্ট্রের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোনো কোনো শহরে গ্রাহকের চাহিদার পর পূরণ করতে না পারার ঘটনাও সংঘটিত হয়। তাই ওই সময় অনেক দেশ ব্যাংক নোটকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার ওপর অনেক শর্তারোপ করে।

ইংল্যান্ডে ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পর ওই রূপান্তর প্রক্রিয়া একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে ১৯২৫ সালে শর্ত সাপেক্ষে নীতি পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়। যদিও রূপান্তরকরণ তখনও নিষেধ ছিল। তথাপি দুর্ঘটনাবশত পরিবর্তনের সুযোগ ছিল।

অতঃপর ১৯৩১ সালে ব্রিটেন সরকার ওই ধরনের ব্যাংক নোটকে স্বর্ণে রূপান্তরিতকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয় এবং সাধারণ জনগণকে বাধ্যতামূলক স্বর্ণের পরিবর্তে শুধু ব্যাংক নোটের ওপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয় সর্বপ্রকারের লেনদেনের ক্ষেত্রে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পারস্পরিক সম্মান রক্ষার্থে এই নিয়ম বহাল রাখে যে, একে অপরের ব্যাংক নোটগুলোকে প্রয়োজনে স্বর্ণে পরিবর্তন করতে পারবে। এই পদ্ধতিকে Gold exchange standard বলা হয়।

৯. এই নীতির ওপর অনেক দিন পর্যন্ত কার্যক্রম চলতে থাকে। পরবর্তীতে একপর্যায়ে ডলারের দাম কমার কারণে আমেরিকা কঠিন অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হয়। ১৯৭১ সালে স্বর্ণের মজুদ কমে যাওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্যও ডলারকে স্বর্ণে রূপান্তর করার আইন রহিত করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল IMF এই দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে যে, তারা বিভিন্ন দেশের কারেন্সির নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বের করতে পারে। যাকে Special Drawing rights বলা হয়। আর পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ৮৮৮৬৭৬ গ্রাম স্বর্ণকে মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়। এই পরিমাণ স্বর্ণ যত নোট দ্বারা ক্রয় করা যাবে, ওই পরিমাণ নোট একটা দেশ ক্রয় করতে পারবে। বর্তমান অবস্থা এই যে, SDR স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে স্বর্ণের বিনিময়ে পরিণত হয়েছে। এবং নোট ও Token Money পরিপূর্ণভাবে স্বর্ণের স্থান দখল করে নিয়েছে। এখন নোট এককভাবে স্বর্ণ-রুপা কোনোটারই প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং কাল্পনিক ক্রয়ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু বেশি দিন এ নীতি স্থায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বরং পূর্বনীতিতে ফিরে যাওয়ার স্লোগান অব্যাহত রয়েছে। এই জন্য পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই স্বর্ণের মজুদ বাড়ানোর ব্যাপারে পূর্ণ সর্তকতা অবলম্বন করে যাচ্ছে। নতুবা বর্তমান যুগের কারেন্সির সাথে স্বর্ণ-রুপার কোনো সম্পর্ক নেই।

মুদ্রা তৈরির ইতিহাস ও তার বিভিন্ন স্তর :

আইয়্যামে জাহেলিয়াত এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত মুদ্রা Goods-এর আকৃতিতে ছিল। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, বর্বরতার যুগে হিরাকলের দিনার এবং পারস্যের বাগলিয়া এবং হুমাইরিয়া দেরহাম মক্কাবাসীর নিকট আসত। কিন্তু সেগুলো ধাতু আকারে হতো। যেমনটি আল্লামা আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া লিখেছেন–

জাহেলীযুগে মক্কাবাসীর নিকট হিরাকলের দিনার এবং পারস্যের বাগলিয়া ও হুমাইরিয়া দিরহাম আসত এবং তারা পরস্পর লেনদেন স্বর্ণ ও রৌপ্যের টুকরা দ্বারা করত। (ফুতুহুল বুলদান ৫৭১)

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামের যুগে ওই কারেন্সিগুলোকে বহাল রেখেছেন। যেমন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমার বিবাহ হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ৪৮০ কিসরাভী দেরহামের মাধ্যমে দিয়েছেন। এমনিভাবে যাকাত-ফিতরাও ওইগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হতো।

জাহেলিয়াতের যুগে লোকজন রুমী ও ফরাসি মুদ্রা দ্বারাও লেনদেন করত। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) যুগেও এভাবেই চলেছে। এবং ওই সব কারেন্সিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে একই অবস্থা চলেছে। তবে তিনি ১৮ হিজরীতে কিসরভী দেরহামের নকশার মতো বাগলিয়া দেরহাম বানিয়েছেন। মোটকথা, হযরত ওমরই সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রার গোড়াপত্তন করেন। তবে কেউ বলেছেন ১৫ হিজরীতে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) সর্বপ্রথম তবরিয়াতে মুদ্রা প্রণয়ন করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর সময় মুদ্রাতে 'আল্লাহু আকবার' লিখা ছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর যুগে ইসলামী মুদ্রার প্রচলন ছিল। পরে কূফা ও বসরায় যিয়াদও মুদ্রা বানিয়েছে। পরবর্তীতে ইয়াজীদ, দ্বিতীয় মু'আবিয়া মারওয়ান বিন হিকাম তাতে কোনো কাজ করেননি। যদিও আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ৭০ হিজরীতে মুদ্রা তৈরি করেছেন। আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান মুদ্রার সংস্কার শুরু করেছেন। এবং ৭৯ হিজরীতে নিরেট ইসলামী মুদ্রা চালু করেছেন। এবং হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট পাঠিয়েছেন। তার যুগে এ জন্য আলাদা বোর্ড ছিল। ওমর বিন হুবাইরা, ইউসুফ বিন ওমর মুদ্রার পরিমাপ বাড়িয়েছেন। এমনকি বনী উমাইয়ার যুগে হুবাইরী, খালেদী, ইউসুফী মুদ্রা বেশি ভালো মনে করা হতো। ওই যুগে দিরহামকে কঠোরভাবে ভেজালমুক্ত রাখা হয়েছিল। ভেজাল দেরহাম তৈরিকে জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হতো। এমনকি ওমর বিন আব্দুল আজিজের যুগে এক ব্যক্তি সরকারি মুদ্রার বিপরীত মুদ্রা বানানোর কারণে তাকে বন্দি করা হয় এবং সাজা ও জেল দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আব্বাসীয় যুগে রাষ্ট্রীয় অস্থিতিশীলতার দরুন ছোট ছোট স্বৈরশাসকের আমলে তাতে ভেজাল মিশ্রণ শুরু হয়ে যায়। যেমন–১. রুপা বেশি খাদ কম। ২. খাদ বেশি রুপা কম। ৩. উভয়টি সমান।

ইবনে মামাতী বলেন যে, ৩০০ হিজরীর পরে রুপা কমে গেছে। এমনকি দুস্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল রৌপ্য মুদ্রা। তার স্থান দখল করে নিয়েছিল খাদ ও ভেজালমিশ্রিত মুদ্রা। বলা হয় যে ইজদুদ্দৌলাহ মিশ্রিত দেরহাম বানিয়েছিল। যাতে তামা সিসা ভর্তি ছিল। প্রথমে তা গ্রহণ করতে ব্যবসায়ীরা অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল। সালাহুদ্দীনের শাসনামলে যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি এমন এক প্রকার দেরহাম বানালেন, যার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল রুপা বাকি অংশ ছিল অন্য ধাতু। এই ধরনের দিরহাম পরবর্তীতে মিসর ও সিরিয়ায় প্রচলিত ছিল।

পয়সার ইতিহাস :

প্রাথমিক যুগে লোকজন আটা-ময়দা ইত্যাদি পণ্য দ্বারা বিনিময় করত। পরবর্তীতে তামার পয়সার প্রচলন শুরু হয়েছে। ক্রমান্বয়ে উন্নয়নশীল দেশে গোল পয়সা বানানো শুরু হলো। সর্বপ্রথম হযরত ওমরের যুগে ১৭ হিজরীতে আরবী পয়সা বানানো হয়। যাতে ওমরের (রা.) নামও লেখা ছিল। পরবর্তীতে এমন পয়সা বানানো হয়েছে যাতে তারিখ ও জায়গার নাম লেখা ছিল। ওইগুলোর মধ্যে প্রাচীন যুগের পয়সা ছিল ৯০ হিজরীর পয়সা। আবুল ফযল হানাফী খোরাসানে পয়সাকে আধুনিকায়ন করেছেন। তাঁর ভাষ্য হলো–

পয়সা আমাদের নিকট এমন যে, তাদের নিকট রুপা যেমন।

তৎকালীন সময়ে ওই মুদ্রা দিয়েই লেনদেন হতো। পর্যায়ক্রমে বাদশাহরা পয়সা বানাত। তবে ৬৫০ হিজরীতে মানুষের কাছে পয়সা বেশি হয়ে গেছিল। প্রায় ৭২০ হিজরীতে আমীর মাহমুদ কায়রোতে পয়সা বানানো শুরু করেছে। এবং পয়সাকেই লেনদেনের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং দিরহামের প্রচলন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পয়সাই স্বর্ণ-রুপার স্থান দখল করে নেয়। হয়ে যায় আসল মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত। পয়সা আসল মুদ্রা হিসেবে অস্তিত্ব লাভের পর সেগুলোর ওজন সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। একপর্যায়ে ৮২৮ তে বাদশাহের ঘোষণা অনুযায়ী পয়সার মধ্যে প্রতিটি রিতিল ১২ দেরহাম নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে তা বেড়ে ১৮ দেরহাম হয়েছে। (আননুকুদুল ই'তিমানিয়্যা ৫২-৭০)

মুদ্রার তৈরির অধিকার কার?

আইনত এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, এই

অধিকার সরকার বৈ অন্য কারো নয়। স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রা তৈরি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শরীয়তের দৃষ্টিতেও কারো জন্য স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রা তৈরির অধিকার নেই। নতুবা সে আইনানুগ শাস্তির যোগ্য হবে। কেননা এর কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে এ ধরনের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে এবং তার মুদ্রা জালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকও এক ব্যক্তিকে এ কাজের কারণে শাস্তি দিয়েছেন।

ড. আদনান আক্তুর্কমানী বলেন-

অর্থাৎ এ কাজকে ইমাম মালেক (রহ.) মাকরুহ সাব্যস্ত করেছেন। এবং বলেছেন যে, ইহা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী কাজ। তবে হানাফী ফক্বীহদের নিকট স্বতন্ত্র মুদ্রা তৈরি করা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় মুদ্রার ন্যায় এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকারক না হওয়া। কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বাঁচার জন্য হানাফীরা ও জমহুরের মত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ স্বতন্ত্র মুদ্রা তৈরি অবৈধ।

শরয়ী ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে মুদ্রার কার্যকারিতা :

মুদ্রার কার্যকারিতা (Functions) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব সমাজে তা কী ভূমিকা পালন করে? এবং মানব সম্প্রদায়কে কী ধরনের সেবা প্রদান করে?

মুদ্রার শরয়ী ও অর্থনৈতিক ব্যবহার প্রায় একই ধরনের। পার্থক্য হচ্ছে এই যে, অর্থনীতিবিদগণ এ দিকগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আর ফুক্বাহায়ে কেরামগণ যাকাত এবং সুদের মাস'আলা ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

বিনিময় মাধ্যম Medium of exchange :

মুদ্রার মৌলিক গুণ হচ্ছে, বিনিময় মাধ্যম হওয়া। পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ব্যবহার হওয়া। মুদ্রা না থাকলে এখন আমাদের পণ্যের বিনিময় পণ্য দ্বারা করতে হতো। যাকে প্রতিদানপদ্ধতি বা Barter বলা হয়। এবং বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। তেমনিভাবে মুদ্রা পারস্পরিক লেনদেনে সেতুবন্ধ, উৎপাদন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও খুব কার্যকর ও উপকারী। যেমন এর মাধ্যমে মেশিনারি ও কাঁচামাল ক্রয় করা যায়। শ্রমিকদের বেতন দেওয়া যায় ইত্যাদি।

পরিমাণ নির্ধারণ (Standard of value) :

মুদ্রা পরিমাণের পরিমাপের মানদণ্ডের কাজ দেয়। যেমন গমের ওজন বাটখারা দ্বারা ও কাপড় গজ দ্বারা মাপা হয়। ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন জিনিসের পরিমাপ এবং মূল্য মুদ্রার মানদণ্ডের ভিত্তিতে মাপা হয়। যেমন- বই ১০০ টাকা। কাপড় গজপ্রতি ৩০ টাকা।

পরিমাণের ভাণ্ডার (Store of value) :

মুদ্রা দ্বারা মূল্যমান স্টক করা যায়। মুদ্রা মানুষের সম্পদ জমা করতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে পণ্য দ্বারা তা সম্ভব নয়। কেননা পণ্য হচ্ছে ধ্বংসশীল। তাছাড়া মুদ্রার মূল্য পণ্যের মতো ঘনঘন ওঠানামা করে না।

ভবিষ্যতে পাওনা পরিশোধের মানদণ্ড : (Standard of deferred payment)

সামাজিক ও মানবিক অনেক কাজ যেমন- বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ ইত্যাদি মুদ্রার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। কেননা মুদ্রার মূল্যের মধ্যে অনেক দৃঢ়তা লক্ষ করা যায়।

প্রফেসর মঞ্জুর আলী বলেন যে, পারস্পরিক লেনদেনের জন্য মুদ্রার অনুপস্থিতিতে পৌরাণিক নিয়মের দিকে ফিরে যেতে হবে। মানবিক সভ্যতা ও কৃষ্টিকালচারের ক্ষেত্রে মুদ্রা হচ্ছে একটা বড় সংস্কার। (মা'আশিয়াত ২/১২০)

ওলামায়ে কেরামের মত :

আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন, মুদ্রা নষ্ট করা মস্তবড় অপরাধ। কেননা ইহা বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নির্ধারণের মাধ্যম। এবং মালের পরিমাপ জানার একটি উপায় এবং মানুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করে। এমনকি অনেক ওলামায়ে কেরাম এটাকে পরিমাণের অস্পষ্টতা পাওয়া যাওয়ার সময় বিচারক বলে আখ্যায়িত করেছেন। (আহকামুল কুরআন ৩/১০৬৪)

আল্লামা ইবনুল হুমাম ও একে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এবং বলেছেন, উভয়টির আবিষ্কারই হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য জিনিস হস্তগত করা যাবে। (ফতহুল কদীর ২/১৫৫)

আল্লামা সারাখসী বলেন যে, এর মাধ্যমে অন্যান্য জিনিসের মূল্য জানা যায়। (আলমাবসূত ২/১৯৩)

আল্লামা ইবনুল কাসিম বলেন, স্বর্ণ, রুপা অন্যান্য সব পণ্যের মূল্য নির্ণয়ের মানদণ্ড। (আহকামুল আওরাকিন নাকদিয়্যা পৃ ৭০)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ পয়সা সম্পর্কে বলেন যে, যেসব পয়সা লেনদেনের মধ্যে থাকে, এগুলোর মধ্যে বিক্রয় মূল্যের দিককে প্রাধান্য দিতে হবে। এবং মালের পরিমাপ বোঝা যাবে। (মজমুউল ফতাওয়া ২৯/৪৬৮)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, দেরহাম দিনার হচ্ছে বিক্রিত পণ্যের মূল্য। আর এ মূল্যই হচ্ছে, ওই মাপকাঠি, যার দ্বারা মালের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। (এলামুল মুআক্কি'য়ীন ২/১৩৭, ১৩৮)

ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা

মাওলানা মুহাম্মদ হাসান

মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট। কুরআন এবং হাদীসে অতি উদারতা ও অতি রক্ষণশীলতা পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় অতি উদারতা ও অতি রক্ষণশীলতার কারণে এই উম্মতের ওপর কখনও কখনও বিপর্যয় নেমে এসেছে। এর মূল কারণ হলো, ব্যক্তিবিশেষের ভিন্নমত সাধারণ উম্মতের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা।

এ রকম একটি মাসআলা হলো, ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা। কিছু লোকের অতি রক্ষণশীলতার কারণে এটি একটি মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার রূপ ধারণ করেছে। এক দিকে ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা অতীব প্রয়োজনীয় মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে এটিকে একটি বিদ'আত এবং ঘৃণিত কাজ মনে করা হচ্ছে। অথচ এই দুই অতিরঞ্জিত মতামতের মাঝখানে হলো এই মাসআলার আসল সমাধান। অর্থাৎ ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা যেমন বাধ্যতামূলক নয়, তেমনি এটি বিদআতও নয়। বরং এটি একটি মুসতাহসান বা উত্তম কাজ। কেউ যদি স্বেচ্ছায় করে ভালো, না করলে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এটি একটি সুন্নাত আমল। এটিকে বিদআত বলার কোনো অবকাশ নেই। ফরজ নামাযের পর দু'আ করা হাদীসের ছয়টি নির্ভরযোগ্য কিতাব অর্থাৎ সিহাহ সিত্তার মাধ্যমে প্রমাণিত। অন্যদিকে দু'আর সময় হাত তোলার কথাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। উপরন্তু হাদীসে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাতে ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করাকে হারাম কিংবা নিষেধ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের জামানা থেকে আজ পর্যন্ত হাজার বছর ধরে ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করার নিয়ম চলে আসছে। এতে কেউ আপত্তি করেনি। ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতো অগণিত ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস চলে গেছেন। কোনো একজন ইমামও এই বিষয়ে আপত্তি করেননি। শুধুমাত্র ইবনে তাইমিয়া (রহ.), ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) আপত্তি জানিয়েছেন। তথাকথিত আহলে হাদীসের আলেম নাসীরুদ্দীন আলবানীর অনুকরণে বর্তমানে কিছু লামাযহাবী আলেম ফরজ নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত সম্পর্কে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যা শরীয়তের যুক্তিতে কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পরে না। হ্যাঁ যারা ফরজ নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করাকে বাধ্যতামূলক মনে করতেন, তারাও ভুলের মধ্যে আছেন। জায়েয কাজকে বাধ্যতামূলক মনে করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ। এতে সন্দেহ নেই।

আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীর উত্থানের আগ পর্যন্ত এবং পেট্রো ডলার পাওয়ার আগ পর্যন্ত ফরজ নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাতের আমল জারি ছিল। এমনকি লা-মাযহাবীদের বড় বড় আলেমগণও তা সমর্থন করেছেন। যেমন সায়্যিদ নাজির হোসাইন সাহেব, নাওয়াব সিদ্দীক হাসান (ভুপালী) সাহেব, সানাউল্লাহ সাহেব, হাফেজ আব্দুল্লাহ সাহেব, মাওলানা মুবারকপুরী সাহেবের মত তাদের বড় বড় আলেমরা নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করাকে বিদআত বলেননি। কয়েকজন ব্যক্তির ভিন্ন মতের কারণে উম্মতের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি আমলকে বিদআত বলা কখনও যুক্তিসম্মত হতে পারে না।

হাদিসের কিতাবসমূহ অধ্যয়নে দেখা যায় দু'আর জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিন বা সময়ের আবশ্যকতা নেই। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে ২২টি জায়গায় দু'আ করার হাদীস পাওয়া যায়। এর মধ্যে ফরজ নামাযের পর অন্যতম। এ মাসআলাটি সমাজের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য কিছু সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা এখানে

হাদীস, সলফে সালেহীনের আমল এবং তাদের বক্তব্য উল্লেখ করে বিষয়টি স্পষ্ট করা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

হাদীস শরীফে এসেছে–

১। عن سلمانؓ قال قال رسول الله ﷺ ان ربكم حى كريم يستحى من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই লজ্জাশীল এবং সম্মানী। বান্দা যখন তাঁর কাছে দুহাত তুলে দু'আ করে, তখন তিনি খালি হাত ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।

ইমাম হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। লামাযহাবীদের আলেম আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটাকে সহীহ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এই হাদীসটি বর্ণনা করে কোনো মন্তব্য করেননি। এতে বোঝা যায়, হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ।

লামাযহাবীদের কথিত আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী সহীহে ইবনে মাজাহ শরীফের নামে এবং জয়ীফ ইবনে মাজাহ শরীফের নামে দুটি কিতাব লিখেছেন। এতে এই হাদীসটি সহীহে ইবনে মাজাহ শরীফে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

লামাযহাবীদের আলেম মাওলানা উবাইদুল্লাহ মোবারকপুরী মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায়, হাদীসটি সকলের নিকট সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য।

এই হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে দু'আর সময় হাত তোলার কথা উল্লেখ রয়েছে, যা কোনো বিশেষ দু'আ কিংবা বিশেষ সম্পর্কে নির্দিষ্ট নয়। বরং সর্বক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। বিধায় ফরজ নামাযের পর দু'আতেও এটি প্রযোজ্য।

২। হযরত ইমাম তিরমিযী (রহ.) তিরমিযী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি অধ্যায় লিখেছেন এভাবে–

باب ماجاء فى رفع الايدى عند الدعاء

দু'আর সময় হাত তোলা সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের বর্ণনা। ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর এভাবে অধ্যায় নির্ধারণ করাটাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দু'আর সময় হাত তোলা ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর কাছে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এতে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করেন।

عن عمر ابن الخطابؓ قال كان رسول الله ﷺ اذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه-

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আর সময় হাত উঠালে তা নামানোর পূর্বে চেহারা মোবারকে মুছে নিতেন। (জামেয়ে তিরমিযী ২/১৭৬, আল মুজামুল আওসাত লিত্তাবরানী ৫/১৯৭ হাদীস নং ৭০৫৩)

এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেছেন হাদীসটি সহীহ। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান।

হযরত উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীস শরীফের মধ্যে স্পষ্টভাবে দু'আর সময় হাত তোলার কথা উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায়, দু'আর সময় হাত তোলা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত এবং দুআর শেষে হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মসেহ করাও সুন্নাত।

৩। عن عبد الله ابن عباسؓ قال قال رسول الله ﷺ سلوا الله ببطون اكفكم ولا تسئلوه بظهورهما فاذا فرغتم فامسحو بهما وجوهكم

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করার সময় হাতের তালু উপর দিকে করো। হাতের তালুর উল্টো দিক করে প্রার্থনা করো না। যখন দু'আ করা শেষ হবে দু'হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মসেহ করো। (আবু দাউদ ৫৫৩, আদ্দাওয়াতুল কবীর লিল বায়হাকী পৃ. ৩৯)

৪। এই হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন–

عن عبد الله ابن عباسؓ قال قال رسول الله ﷺ اذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولاتدع بظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك (ابن ماجه كتاب الدعا)

হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত আবু দাউদ শরীফের উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে লামাযহাবী কোনো কোনো আলেম প্রশ্ন তুলেছেন যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এই হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। এই কারণে হাদীসটি জয়ীফ। এই প্রশ্নের উত্তরে লামাযহাবীদেরই আলেম মাও.

শামসুল হক আজিমাবাদী আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আউনুল মাবুদে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ইমাম আবু দাউদ (রহ.) যে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি সে বর্ণনাকারীর নাম ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ইবনে মাজাহ শরীফে উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.)ও তাঁর কিতাব তাকরীবুত তাহযীবে ওই বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন। যার ফলে হাদীসটি জয়ীফ বলার আর কোনো অবকাশ থাকে না।

লামাযহাবীদের কোনো আলেমের কথা অনুযায়ী যদি এই হাদীসটির সনদ জয়ীফও ধরে নেওয়া যায় তখনও আলোচ্য বিষয়ে হাদীসটি দলিল হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। কারণ লামাযহাবীদের আলেম হাফেজ আব্দুল্লাহ রওপড়ী তাঁর একটি ফতওয়ায় লিখেছেন শরীয়তের বিধান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো, কোনো কিছুকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। দ্বিতীয় প্রকার হলো, অবৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রথম প্রকারের বিধানের জন্য সহীহ হাদীস, জয়ীফ হাদীস দুটিই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় প্রকারের জন্য শুধুমাত্র সহীহ হাদীসই প্রযোজ্য।

ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ ইহা একটি জায়েয কাজ, হারাম কাজ নয় বিধায় এই মাসআলাটি প্রমাণিত হওয়ার জন্য সহীহ জয়ীফ উভয় প্রকারের হাদীসই প্রযোজ্য হবে।

অধিকন্তু তিনি এও মেনে নিয়েছেন যে, ফরজ নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করা মুস্তাহাব আমল। (ফতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস ১/২২-১৯৮৭ইং)

٥। حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم ابن عتبة بن ابى وقاص عن السائب بن يزيد عن ابيه ان النبى ﷺ كان اذا دعا فرفع يديه ومسح وجهه بيديه (ابو داؤد كتاب الصلوة باب الدعاء)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন তখন নিজের হাত চেহারা মোবারকে ফেরাতেন। (আবু দাউদ) (হাদীসটি মুহাদ্দিসীনের কাছে গ্রহণযোগ্য)

٥। عن محمد بن ابى يحى الاسلمى قال رأيت عبد الله بن الزبير رأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل ان يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال له ان رسول الله ﷺ لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته (مجمع الزوائد للهيثمى (١٦٩/١٠

মুহাম্মদ ইবনে আবী ইয়াহইয়া বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) এক ব্যক্তিকে নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দু'আ করতে দেখেন। ওই ব্যক্তি নামায শেষ করার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায শেষ করার পূর্বে দু'আর জন্য হাত উঠাতেন না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এই হাদীসটি হাফেজ ইবনে হায়সাম তাবরানীর হাওয়ালায় বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ورجاله ثقات এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

৬। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার এই হাদীসে ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

عن اسود العامرى عن ابيه قال صليت مع رسول الله ﷺ الفجر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا

আসওয়াদ আমেরী নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম ফেরানোর পর পাশ ফেরালেন এবং হাত তুলে দু'আ করলেন। (এলাউস সুনান ৩/১৬৪, ফাতাওয়ায়ে নযীরিয়া ২৪৫, ২৬৫, ৩৫২)

৭। হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই বর্ণনাটি বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে হাত উঠিয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।

قال رسول الله ﷺ الصلوة مثنى مثنى تشهد فى كل ركعتين وتضرع وتخشع وتسكن ثم تقنع يدك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك

এই হাদীসে প্রমাণিত হয়, নামায একাগ্রতা ও খুশু-খুজুর সাথে পড়া এবং এরপর দুই হাত তুলে হাতের পাতা চেহারার সামনে রেখে দু'আ করা। (তিরমিযী, নাসায়ী)

মুহাদ্দিসীন ও ফক্বীহদের দীর্ঘ যাচাই ও আলোচনার পর হাদীসটি

নির্ভরযোগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছে।

৮। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

مامن عبد بسط كفيه فى دبر كل صلوة ثم يقول اللهم الهى ابراهيم واسحق يعقوب الخ الا كان حقا على الله ان لا يرد يديه خائبتين۔

যে ব্যক্তি নামাযের পর হাত বিস্তৃত করে এই দু'আ করবে "হে আল্লাহ! যিনি আমার এবং ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব (আ.)-এর খোদা, জিবরাঈল, মিকাইল, ইসরাফিল (আ.)-এরও খোদা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আমার দু'আ কবুল করুন। কারণ আমি মুখাপেক্ষী, পেরেশান এবং অপারগ। আমাকে দ্বীনের সাথে হেফাজত করুন, গুনাহ থেকে বাঁচান, অভাব দূর করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুই হাতকে খালি ফেরাবেন না। (আমলুল ইয়াউমি ওয়াল্লায়লাতি ৪৮, ৪৯, কানযুল উম্মাল ২/৮৪)

এই হাদীসের দুজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে কিছু কথা থাকলেও ইবনে মুঈন বলেছেন– لا بأس به অর্থাৎ হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করাতে কোনো সমস্যা নেই। একই মন্তব্য করেছেন ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান। সুতরাং হাদীসটি নির্ভরযোগ্য।

৯। ইমাম বুখারী (রহ.) আপন কিতাব আদ্দাওয়াতে باب رفع الايدى فى الدعاء হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন–

قال ابو موسى دعا النبى ﷺ ورفع يديه ورأيت بياض ابطيه

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করেছেন, দু'আর মধ্যে উভয় হাত এটুকো উঠিয়েছেন যাতে তাঁর হাতের পাতার শুভ্রভাগ দেখা গিয়েছে।

এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহ.) এই অধ্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে–

رفع النبى ﷺ يديه وقال اللهم۔۔)

এই তিনটি হাদীসের আলোকে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লেখেন, প্রথম হাদীসটি তাদের জবাব, যারা বলেন হাত তুলে দু'আ করা শুধু ইস্তিস্কার নামাযের জন্যই খাস। দ্বিতীয় হাদীসদ্বয় তাদের জবাব যারা বলেন, ইস্তিস্কার দু'আ ছাড়া অন্য কোনো দু'আতে হাত উঠানো যাবে না। (ফতহুল বারী ১১/১১৯)

এই মাসআলার সমর্থনে হযরত ইবনে হাজর (রহ.) আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী এবং হাকেমের হাওয়ালায় আরো কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তা থেকে কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

১০। ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فانى يستجاب لذلك

"এরপর তিনি উল্লেখ করেন, এক ব্যক্তি লম্বা সফর করে এবং খুব পেরেশান ও মলিন মুখ হয়ে আসমানের দিকে হাত তুলে দু'আ করে, হে আল্লাহ!...তখন সে ব্যক্তির দু'আ কবুল করা হয়। (রাফউল ইয়াদাইন ১৮, সহীহে মুসলিম কিতাবুদ দু'আ)

১১। عن الزهرى قال كان رسول الله ﷺ يرفع يديه عنه صدره فى الدعاء ثم يمسح

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করার সময় বুক পর্যন্ত হাত তুলতেন এবং দু'আ শেষে হাত মোবারক চেহারায় ফেরাতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২৪৭)

১২। اخبرنا سلام بن معاذ حدثنا حماد بن الحسن عن عنبه حدثنا ابو عمر الحوضى حدثنا سلام المدايني عن زيد السلمى عن معاوية عن قرة عن انس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ اذا قضى صلوته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال اشهد ان لا اله الا الله۔

"নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের ডান হাত কপালের ওপর ফেরাতেন...। (ইবনে সানী ৩৯)

সেহাহ সিত্তার অনেক হাদীস থেকে এ কথা তো দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'আর সময় হাত উঠিয়েছেন এবং হাত মুখে ফিরিয়েছেন।

ইমাম নববী (রহ.) মুহাযযাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আল মাজমূ" গ্রন্থে দু'আর মধ্যে হাত উঠানো এবং হাতের তালু মুখে ফেরানোর ব্যাপারে ত্রিশটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি এর বিধান সম্পর্কে মন্তব্য করেন দু'আতে হাত উঠানো মুস্তাহাব। (আল মাজমু ৪৪৮-৪৫০)

সব শেষে ইমাম নববী (রহ.) লেখেন যারা এই হাদীসগুলোকে কোনো সময় বা স্থানের সাথে নির্দিষ্ট করে তারা

বড়ই ভ্রান্তির মধ্যে আছে।

তিনি কিতাবুল আযকারে নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করার বিষয়টি জায়েয বলে উল্লেখ করেছেন। এবং এর প্রমাণে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত উমর (রা.)-এর বর্ণনা এবং আবুদাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। (কিতাবুল আযকার ২৩৫)

বিষয়টি নিয়ে হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ফতহুলবারী ১১/১১৮ এবং বুলুগুল মুরামে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করে দু'আতে হাত উঠানো মুস্তাহাব প্রমাণ করেছেন।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো, হাত তুলে দু'আ করা মুস্তাহাব এবং নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করাও উত্তম কাজ।

বর্তমানে লা-মাযহাবী যারা নামাযের পর দু'আ করাকে সরাসরি বিদআত বলে হক্কানী উলামায়ে কেরামের বিষোদগার করছেন তাদের বিজ্ঞজনদের এ ব্যাপারে মতামত কী, দেখা যাক।

তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাব নযলুল আবরার। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে–

"দু'আ কারী দু'আর সময় হাত উঠাবে। কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলবে। এটি দু'আর আদব। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে স্বীকৃত।

এরপর লেখেন, যে দু'আই হোক, যখনই হোক, চাই তা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে হোক বা অন্য সময় তাতে হাত তুলে দু'আ করা উত্তম আদব। হাদীসের মর্মবাণী এর প্রমাণ বহন করে। মূলত নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করার বিষয়টি নিতান্তই স্বাভাবিক এবং সবার জানা হওয়ায় সে ব্যাপারে ভিন্নভাবে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। (নাযলুল আবরার ৩৬)

মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াজীতে লেখেন

القول الراجح عندى ان رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلوة جائز۔

নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা জায়েয। (তুহফাতুল আহওয়াজী ২/২০২, ১/২৪৪)

জামেয়া সালাফিয়া বেনারস থেকে প্রকাশিত আলমুহাদ্দিস জুন ১৯৮২ তে মাওলানা উবাইদুল্লাহ মোবারকপুরী একটি ইস্তিফতার জবাবে লেখেন–

"ফরজ নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করাও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে স্বীকৃত বিষয়।"

আরো লেখেন, "আমাদের মতে ফরজ নামাযের সালাম ফেরানোর পর বাধ্যবাধকতা ছাড়া ইমাম ও মুক্তাদী হাত উঠিয়ে অনুচ্চস্বরে দু'আ করা জায়েয। এটি একাকী হোক বা সামষ্টিকভাবে হোক, আমাদের আমলও এটি।" (মুহাদ্দিস জুন ১৯৮২)

মোট কথা হলো, নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করার বিষয়টি যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি স্বীকৃত বিষয়। যে সকল তথাকথিত লা-মাযহাবীরা এটিকে বড় আওয়াজে বিদআত বলছেন, তাদের মুরব্বিরাও একে নবীজির আমল এবং উত্তম বা জায়েয আমল বলে ফতওয়া দিয়েছেন। যার কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান ফিতনার জামানায় এসে বিষয়টিকে নতুন করে প্রচার করা এবং সরাসরি এই কাজকে বিদ'আত বলা মুসলমানদের মাঝে নতুন ফিতনা সৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়।

এই ব্যাপারে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) সমাধানমূলক যে কথাটি বলেছেন তা সকলের প্রণিধান যোগ্য। তিনি লেখেন–

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রায় দু'আ যিকির হিসেবেই হতো। তাঁর জিহবা মোবারক সব সময় আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকত।"

দু'আকে শুধু হাত তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা উচিত নয়। আবার এমনও নয় যে, দু'আতে হাত তোলা বিদআত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের পরে দু'আতে হাত তুলেছেন। কিন্তু কম তুলেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন যিকিরই সব সময় করতেন, যা তাঁর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল। বাকি বিষয়গুলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের তারগীব দেওয়ার জন্য করেছেন।

সুতরাং সেদিক লক্ষ করে কেউ যদি নামাযের পর দু'আতে হাত তোলেন এবং তা নিয়মিত করেন তাহলে বলতে হবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তারগীবাতের ওপর আমল করছেন। (তাতে কারো আপত্তি করার সুযোগ নেই।)

এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব

মাওলানা মুহাম্মদ হারুন

আরবী ভাষায় দাড়িকে বলা হয় لحية. লিহয়িা বা লাহয়া। এর আভিধানিক অর্থ হলো থুতনিসহ মুখের দুই পাশের ওই হাড়, যার ওপর দাঁতসমূহ অবস্থিত। প্রাপ্ত বয়সে ওই হাড়ের ওপর যে লোম বা কেশ গজায় ওই লোম বা কেশগুলোকেই হাড়ের নামকরণে لحية বলা হয়।

বহু আরবী ও ইসলামী অভিধান, গ্রহণযোগ্য ফিকহ ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থের বর্ণনা মতে চেহারার সর্বদিকে মোচ ব্যতীত চুলের মতো যে পশম বয়সের অনুপাতে গজায় তা সবই শরয়ী পরিভাষায় দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। যার নিচের সীমানা হলো মুখের থুতনি আর উপরের সীমানা হলো উভয় কানপট্টি ও উভয় চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থান। আল্লামা ইবনে আবেদীন যেমন বলেছেন–

اللحية بكسر اللام وفتحها وظاهر كلامهم ان المرادبها: الشعر النابت بجميع الخدين والعارض ما بينها وبين العذار وهو المقدار المحاذى للاذن يتصل من الاعلى بالصدغ ومن الاسفل بالعارض (البحر الرائق)

দাড়ি সম্পর্কে মূল কথা হলো, দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এর শরয়ী পরিমাপ হলো এক মুষ্টি পরিমাণ। দাড়ি রাখা ইসলামের শেআর এবং নিদর্শন। এটি সকল নবীর সুন্নাত। এটি ভদ্রতা, মহত্ব এবং ইজ্জত ও সম্মানের আলামত। এর মধ্যেই রয়েছে পৌরুষত্বের পরিপূর্ণতা। এভাবে দাড়ি রাখা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সার্বক্ষণিক আমল ছিল। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, ফুকাহা মুহাদ্দেসীন, সলফে সালেহীনেরও আমল ছিল এরূপ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটিকে ফিতরাত তথা মানুষের প্রকৃতি বলেই আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং দাড়ি রাখা আবশ্যক। ছেঁচে ফেলা বা এক মুষ্টির ভেতর কাটা হারাম এবং কবিরা গোনাহ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়ির কতখানি গুরুত্ব দিতেন এবং ইসলামে দাড়ি রাখার আবশ্যকতা কোন পর্যায়ের তা নিম্নের কয়েকটি হাদীস থেকে অনুমেয়–

১। হযরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন–

انه امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মোচ খাটো এবং দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিতেন। (সহীহে মুসলিম ১/১২৯, ২৫৯)

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب

তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো, দাড়ি লম্বা করো, মোচ খাটো করো। (সহীহে বুখারী ২/৮৭৫)

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

جزوا الشوارب وارخو اللحى وخالفوا المجوس

তোমরা মোচ খাটো করো এবং দাড়ি নিচের দিকে ঝুলাও, অগ্নিপূজারীদের বিরোধিতা করো। (সহীহে মুসলিম ১/২২২, ২৬০)

৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

انهكوا الشوارب واعفوا اللحى

তোমরা মোচ খাটো এবং দাড়ি লম্বা করো। (সহীহে বুখারী ২/৮৭৫)

৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

اعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى

তোমরা দাড়ি লম্বা করো এবং মোচ খাটো করো এবং তোমাদের চুলের সাদা রং পরিবর্তন করো। ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকো। (কানযুল উম্মাল ৬/৬৫৩)

৬। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء وقال الراوى ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة

দশটি বস্তু ফিতরাত প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। গোঁফ ছোট করা, দাড়ি বড় করা, মিছওয়াক করা, নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলা, নখ ছোট করা, আঙুলের গিরা ও জোড়া ধৌত করা, বগলের চুল উপড়ানো, নাভির নিচের চুল কামানো, পেশাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দশ নাম্বারটি ভুলে গিয়েছি, তবে মনে হয় তা হবে কুলি করা। (সহীহে মুসলিম ১/২২৩)

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

كان المجوس تعفى شواربها وتحفى

لحاها فخالفواهم فجزوا شواربكم واعفوا لحاكم

অগ্নিপূজকরা মোচ লম্বা করে এবং দাড়ি নিশ্চিহ্ন করে, তাই তোমরা তাদের বিরোধিতা করো, মোচ খাটো এবং দাড়ি লম্বা করো। (আত তারীখুল কাবীর ১/১৪০)

৮। হযরত হাসান (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

عشر خصال عملتها قوم لوط بها هلكوا منها---قص اللحية وطول الشوارب

দশটি স্বভাব এমন ছিল, যেগুলো অবলম্বন করে কওমে লূত ধ্বংস হয়ে গেছে। তন্মধ্যে একটি ছিল দাড়ি কর্তন করা এবং গোঁফ লম্বা করা। (দুররে মনসূর ৫/৬৪৪)

৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবা (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

جاء رجل من المجوس الى رسول الله ﷺ وحلق لحيته واطال شاربه فقال النبى ﷺ ماهذا؟ قال هذا فى ديننا قال فى ديننا ان نجز الشارب وان نعفى اللحية ـ

জনৈক অগ্নিপূজক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এ অবস্থায় আসল যে, তখন সে তার দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে এবং মোচ লম্বা করে রেখেছে। এ অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন তুমি এটা কী করেছো? সে উত্তর দিল, এটা আমাদের ধর্মে আছে। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, আমাদের ধর্মে আছে, মোচ কর্তন করা এবং দাড়ি রম্বা করা। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৮/৩৭৯)

১০। আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

ان لله ملائكة تسبيحهم سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالقرون والذوائب

আল্লাহ তা'আলা কিছু ফেরেশতা আছেন, যাদের তাসবীহ হলো এই পবিত্র ওই সত্তা যিনি পুরুষদের দাড়ি দিয়ে সজ্জিত করেছেন আর নারীদের করেছেন সুন্দর চুলের বেণি ও খোঁপা দিয়ে। (কাশফুল খিফা ১/৫৩৮, তাকমিলায়ে বাহরুর রায়েক ৮/৩৩১)

দাড়ি রাখার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস থেকে দশটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো। প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে দাড়ির গুরুত্ব কতটুকু ছিল এবং ইসলামে এর আবশ্যিকতা কোন পর্যায়ের উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

দাড়ির পরিমাপ কী হবে?

এককথায় বলা যায় নবী (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের দাড়ি যেভাবে এবং যেটুকু ছিল, সেটুকু রাখাই মূল বিষয়। হাদীস শরীফে এসেছে–

كان النبى ﷺ اذا اغتم اخذ لحيته بيده ينظر فيها

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন চিন্তিত হতেন তখন তিনি নিজ হাতে দাড়ি ধরে তা দেখতেন। (কানযুল উম্মাল ১/৭০১)

আরেক হাদীসে আছে–

عن رويفع بن ثابت قال قال لى رسول الله ﷺ يارويفع هل الحيواة ستطول بك بعدى فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترااو استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا منه برئ

হযরত রুআইফ ইবনে সাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে রুআইফ! আমার ওফাতের পর তুমি যদি বেঁচে থাকো তাহলে মানুষদের বলে দেবে যে ব্যক্তি দাড়ি বেঁধে রাখে অথবা গলায় রশি বাঁধে অথবা কোনো জীবের গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ব্যাপারে মুক্ত। (মিশকাত ২/৪৩, আবু দাউদ)

আরেক হাদীসে আছে–

عن انسؓ قال كان رسول الله ﷺ اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرانى ربى

হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ওজু করতেন, তখন এক তালু পানি নিয়ে গলার নিচে রাখতেন এবং তা দিয়ে তাঁর দাড়ি মোবারক খিলাল করতেন। আর বলতেন এভাবে আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন। (আবু দাউদ, মেশকাত ১/৪৬)

আরেকটি হাদীসে আছে–

عن ابى معمر قال سالنا خبابا أكان النبى ﷺ يقرأ فى الظهر والعصر؟ قال نعم، قلنا باى شئ كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته

হযরত আবু মা'মার (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলে আমরা হযরত খাববাব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি জোহর এবং আসরের নামাযে ক্বিরাআত পাঠ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন হ্যাঁ। আমরা বললাম আপনারা কিভাবে বুঝতেন? তিনি বলেন, তাঁর দাড়ি নড়াচড়া করার দ্বারা। (সহীহে বুখারী ১/৭৬০)

এই কয়টি হাদীসসহ আরো বহু হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাড়ি মোবারক লম্বা ছিল।

দাড়ির পরিমাণ কতটুকু হবে?

হাদীস শরীফে আছে–

عن عمرو بن شعيب انه ﷺ كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا على قدر القبضة ـ

হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় দাড়ির নিচ

ও আশপাশ থেকে মুষ্টি পরিমাণের বাইরের অংশ কাটছাঁট করতেন। (শরহু শিরআতিল ইসলাম-২৯৮)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাড়ি মোবারক এক মুষ্টির বেশি ছিল এবং এক মুষ্টি পরিমাণ রেখে বাকিটা কর্তন করা যাবে।

সাহাবায়ে কেরাম দাড়ি লম্বা রেখেছেন। তবে এক মুষ্টির পর কাটার স্বীকৃতি সাহাবায়ে কেরামের আমলে পাওয়া যায়।

١ । عن مروان يعنى بن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع مازاد على الكف

হযরত মরওয়ান ইবনে সালেমে মুকাফা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর (রা.)-কে দেখেছি তিনি স্বীয় দাড়ি মুঠ করে ধরে অবশিষ্ট অংশটুকু কেটে ফেলতেন। (আবু দাউদ ২/৭৬৫)

٢ । كان ابن عمرؓ اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه

হযরত ইবনে উমর (রা.) হজ্ব ও উমরার সময় নিজ দাড়ি মুঠ করে ধরে বাহিরের অংশটুকু কর্তন করে ফেলতেন। (সহীহে বুখারী ৭/৮৩ হা. ৫৮৯২)

٣ । عن ابى زرعة قال: كان ابو هريرةؓ يقبض على لحيته ثم يأخذ مافضل عن القبض

আবু যুর'আ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) স্বীয় দাড়ি মুঠ করে ধরে বাহিরের অংশটুকু কর্তন করে ফেলতেন। (ফতহুল বারী ১০/৬৩২)

٤ । عن الحسن قال كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية

হযরত হাসান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরা (সাহাবীগণ) মুঠের বাহিরের অংশটুকু কর্তন করে ছোট করাকে অনুমোদন করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/২২৬ হা. ২৫৪৭০)

হাদীসের অসংখ্য বাণী থেকে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ, আমল এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন তবে তাবেঈনের আমল, ইমাম ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের আমল ও দিকনির্দেশনার আলোকে আকাবের উলামায়ে কেরাম দাড়ির ব্যাপারে যে বিধান ঠিক করেছেন তা নিম্নরূপ।

দীর্ঘ আলোচনার পর হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) লেখেন

وقص اللحية۔۔۔ وهو اليوم شعار كثير من المشركين والافرنج والهنود ومن لاخلاق لهم فى الدين ممن يتبعونهم ويحبون ان يتزيوا بزيهم۔ (بذل المجهود ج:١ ص٣٣)

দাড়ি কর্তন করা বর্তমান যুগে ইহুদী নাসরাদের শে'আর বা নিদর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকও তা গ্রহণ করছে যাদের সাথে দ্বীনের সম্পর্ক নেই। বরং ইংরেজদের রীতিনীতি অনুযায়ী চলাকে তারা পছন্দ করে।

এরপর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর উক্তি উল্লেখ করেন–

وكذا يحرم على الرجل قطع

অর্থাৎ দাড়ি মুণ্ডানোর মতো দাড়ি কাটাও হারাম। (বজলুল মজহুদ ১/৩৩)

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) লেখেন–

حلق كردن لحيه حرام است وروش افرنج وهنود است وگذاشتن آں بقدر قبضه واجب است

দাড়ি মুণ্ডানো হারাম। এটি পশ্চিমা এবং অমুসলিম মুশরিকদের রীতি। এক মুষ্টি পর্যন্ত দাড়ি রাখা ওয়াজিব। (আশইয়াতুল লুমআত ১/২১২)

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বাওয়াদেরুন নাওয়াদেরে লেখেন– "দাড়ি মুণ্ডানো এবং কাটা হারাম। এর ওপর উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে। (২/৪৪৩)

وقال العلائى فى كتاب الصوم قبيل فصل العوارض ان الاخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه احد واخذ كلها فعل يهود الهندومجوس الاعاجم فحيث اد من على فعل هذا المحرم يفسق وان لم يكن ممن يستبيحونه ولا يعدونه فارقا للعدالة والمروة۔

অর্থাৎ এক মুষ্টির আগে দাড়ি কাটা উম্মতের কেউ অনুমতি দেননি। (তানকীহুল ফাতাওয়া আল হামেদিয়্যা ১/৩৫১)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফয়জুল বারীতে উল্লেখ আছে–

واما قطع دون ذلك فحرام اجماعا بين الائمة رحمهم الله۔

এক মুষ্টির কমে দাড়ি কাটা সকল ইমামের ঐক্যমতের ভিত্তিতে হারাম। (৪/৩৮০)

দাড়ির ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করা যায়। কারণ কিতাবাদীতে দাড়ির এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, এতদ সংক্রান্ত বড় বড় গ্রন্থও রচিত হয়েছে। সামান্য পরিসরে এই আলোচনায় এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এর সর্বনিম্ন পরিমাপ এক মুষ্টি। এক মুষ্টির পর দাড়ি কাটার অনুমতি আছে। কিন্তু এক মুষ্টির কমে দাড়ি কাটা অথবা মুণ্ডানো সম্পূর্ণ হারাম। যারা সর্বক্ষণ হারাম কাজে লিপ্ত তারা শরয়ী ভাষায় ফাসিক।

সুতরাং মুসলমানদের এই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। কারণ দাড়ি কাটা, ছাঁটা বা মুণ্ডানোর গোনাহ সর্বক্ষণ নিজের সাথে লেগে থাকে। যতক্ষণই মুসলমানের জীবনে এই অবস্থা পরিগ্রহ, ততক্ষণ তিনি গোনাহে কবীরার সাথে জড়িত বলে বিবেচিত। এই কারণে বিষয়টি বড়ই জটিল এবং জঘন্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

আলেম সমাজের প্রতি কেন এত বিষোদগার?

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

এ বসুন্ধরার উষালগ্ন থেকে মহান আল্লাহর একটি চিরায়ত নিয়ম হচ্ছে, তিনি মানবজাতির হেদায়ত এবং পথপ্রদর্শনের জন্য যেখানেই কিতাব অবতীর্ণ করেন, সেখানেই নবী-রাসূলের আকৃতিতে নিজের নির্বাচিত বান্দাদেরকে প্রেরণ করেন। মানবসমাজকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিতাব অবতীর্ণ করাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং প্রতিটি কিতাবের সাথে নবী-রাসূলও প্রেরণ করা হয়েছে। নবুওয়াতের স্বর্ণালি রাজপথে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বহুবার যে, কোনো অঞ্চলে শুধুমাত্র নবী প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু তার ওপর অবতীর্ণ হয়নি কোনো আসমানী গ্রন্থ। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় চিরুনি অভিযান চালিয়েও এ ধরনের কোনো ঘটনা পাওয়া যাবে না, কোনো অঞ্চলে শুধুমাত্র কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু তার সাথে কোনো নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়নি। এ কারণেই এ এক স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা, নবী-রাসূলের সংখ্যা প্রায় লাখের ঊর্ধ্বে। কিন্তু প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব মাত্র চারটি। তাছাড়া কয়েকটি সহীফার উল্লেখ পাওয়া যায়। তা থেকে বোঝা গেল, নবীদের একটি বড় অংশের ওপর কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থই অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলার এই চিরন্তন বিধান থেকে এ কথাই প্রতিভাত হয়, মানবজাতির হেদায়ত এবং বিশ্ববাসীর সংশোধন এবং পরিশুদ্ধির জন্য আসমানী উপদেশমালার (আসমানী গ্রন্থ) পাশাপাশি আল্লাহর ওই সব বান্দার উপস্থিতিও এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা, যারা মানবজাতির সামনে মহান প্রভুর বিধিবিধানের বাস্তব উপমা উপস্থাপন করবে এবং নিজেদের পুরো জীবন আসমানী ওহির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য ব্যয় করবে। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এই বাস্তবতার প্রতি মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে এমন–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

আমি আপনার কাছে পবিত্র কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ওই সব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা নাহল আয়াত ৪৪)

আম্বিয়ায়ে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রায়োগিক উপমা ব্যতিরেকে আসমানী কিতাব থেকে উপকৃত হওয়া অসম্ভব। সংশোধন এবং পরিশুদ্ধি তো অনেক পরের কথা, বরং কোনো সাধারণ বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের এটিই স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, প্রায় প্রতিটি শাস্ত্রের ওপর লিখিত গ্রন্থাবলি পৃথিবীর প্রতিটি ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। যদি কেউ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কোনো শাস্ত্রের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায়, তা হবে বোকার স্বর্গে বসবাস করারই নামান্তর। যেমন ধরুন, চিকিৎসা শাস্ত্রের অজস্র গ্রন্থ মার্কেটে পাওয়া যায়। এখন কেউ যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা ও রোগী দেখা আরম্ভ করে, তার 'কল্যাণে' কবরস্থানে যে অনেক নতুন নতুন কবর রচিত হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যত দিন পর্যন্ত সে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সান্নিধ্যে একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না করবে এবং তার নির্দেশিত পথে পরিচালিত না হবে, তত দিন পর্যন্ত সে ডাক্তারির সার্টিফিকেটও পাবে না এবং চিকিৎসা করার অনুমতিও দেওয়া হবে না। ডাক্তারিবিদ্যা তো অনেক পরের কথা। অভিজ্ঞ ব্যক্তির সান্নিধ্য ব্যতিরেকে কেউ সাধারণ বাবুর্চিও হতে পারে না। শুধুমাত্র খাদ্যের রেসিপি অধ্যয়ন করে কেউ সাধারণ তরকারি রান্নাও করতে পারবে না।

এখন ভাবার বিষয় হচ্ছে, ছোট থেকে ছোট কোনো বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞ হতে চাইলে ওই বিষয়ের পারদর্শী লোকের শরণাপন্ন হতে হয়। তাহলে পরোকালীন শান্তি এবং মানবজীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ণয়ের কণ্টকাকীর্ণ পথে কোনো উদ্‌ভ্রান্ত নাবিক কিভাবে কোনো পথনির্দেশক ছাড়া সফল হতে পারে? মানবজাতির হেদায়েতের জন্য 'রিজালুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর বিশেষ নির্বাচিত বান্দার' গুরুত্ব কতটুকু, তা কুরআনের বিভিন্ন বাচনভঙ্গি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

কুরআনে করীম রিজালুল্লাহকে সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপক সাব্যস্ত করেছে। যেমন সূরা ফাতিহায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সূরায়ে ফাতিহায়

যেখানে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে সরল পথের জন্য প্রার্থনা করতে আদেশ দিয়েছেন, সেখানে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, সিরাত মুস্তাকীম তথা সরল পথ কোনটি। সরল পথের ব্যাখ্যায় কোনো গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি, বরং সেখানে রিজালুল্লাহর উদ্ধৃতিই দেওয়া হয়েছে। صراط الذين انعمت عليهم সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। নেয়ামতপ্রাপ্ত রিজালুল্লাহর দল কোনটি? সে সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও 'সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ' আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম। (সূরা আন নিসা, আয়াত ৬৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পাকিস্তানের সাবেক মুফতী আজম মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) লিখেন, এখানে একটি চিন্তা করার বিষয় আছে। সে চিন্তা-ভাবনার পর আপনার সামনে উন্মোচিত হবে জ্ঞানের নবদিগন্ত। বিষয়টি হচ্ছে, সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল পথ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এত লম্বা বাক্য না বলে শুধু صـــــــراط অথবা صراط القرآن الرسول (সরল পথ অর্থ রাসূলের পথ অথবা কুরআনের পথ) বলে দিলেই যথেষ্ট হয়ে যেত। তা সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টও বটে। কারণ পুরো কুরআনই সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুরো জীবনীই তাঁর বিশ্লেষণ। কিন্তু পবিত্র কুরআন এই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ছেড়ে সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যায় স্বতন্ত্র দুটি আয়াতের মাধ্যমে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিককে প্রতিভাত করেছে। কুরআনের অলৌকিকতাপূর্ণ ভাষা হচ্ছে, যদি সরল পথের সন্ধানী হও, তাহলে তাদেরকে খুঁজে বের করো এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে সচেষ্ট হও। কুরআন এ কথা বলেনি যে, কুরআনের রাস্তা অবলম্বন করো। কেননা, শুধুমাত্র কিতাব মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। আর এ কথাও বলেনি, রাসূলের পথ অনুসরণ করো। কারণ রাসূল চিরঞ্জীব নন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর অন্য কোনো নবী-রাসূলেরও আগমন ঘটবে না। সে জন্য যাদের মাধ্যমে সরল পথের সন্ধান পাওয়া যাবে, সেখানে নবী ছাড়া এমন লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের সরব পদচারণে কেয়ামত পর্যন্ত মুখরিত হবে বিশ্ব এবং বিশ্ববাসী। যথা সিদ্দীকীন, শুহাদা এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। সারকথা হচ্ছে, সরল পথের সন্ধানীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কিছু মানুষকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কোনো কিতাবের উদ্ধৃতি দেননি। (মাআরিফুল কুরআন ১/৩৯)

পবিত্র কুরআন বারবার এ ধরনের আদর্শ মানবদের আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ও দরদমাখা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে। সূরা মারইয়ামে অনেক নবী রাসূলের আলোচনার পর বলা হলো, তাদের কথা স্মরণ করো। এই ধারা হযরত যাকারিয়া (আ.) থেকে হযরত ইদরীস (আ.)-এর ওপর গিয়ে সমাপ্ত হয়। কুরআন বলছে, ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। (সূরা মারইয়াম, আয়াত ২) হযরত মারইয়াম (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে– وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন। (সূরা মারইয়াম, আয়াত ১৬)

হযরত ইয়াহইয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে-

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (١٣) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١٥)

হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ করো। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পরহেযগার। পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত-নাফরমান ছিল না। তাঁর প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুরুত্থিত হবে। (সূরা মারইয়াম, আয়াত ১২-১৫)

হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে–

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

আপনি এই কিতাবে ইবরাহীম

(আ.)-এর কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৪১)

হযরত ইদরীস (আ.) পর্যন্ত গিয়ে নবীগণের এই পবিত্র ধারা পরম্পরার পরিসমাপ্তি টেনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

এরাই তারা, নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন। (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৫৮)

সূরা আনআমে হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত নূহ, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত আইয়ূব, হযরত ইউসুফ, হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত যাকারিয়া, হযরত ইয়াহইয়া, হযরত ঈসা, হযরত ইলিয়াস, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইয়াসা, হযরত ইউনুস, হযরত লূত (আ.)সহ অন্য নবীদের আলোচনা শেষে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ

এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথপ্রদর্শন করেছিলেন। অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। (সূরা আল-আনআম, আয়াত ৯০)

পবিত্র কুরআন আদ্যোপান্ত 'রিজালুল্লাহ'র আলোচনায় ভরপুর। অনেক সূরা এমন রয়েছে, যেখানে শুধু নবীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সূরা আশশুআরা, আম্বিয়া এবং সূরা ইউসুফে শুধুমাত্র নবীদের কাহিনীই বিবৃত হয়েছে। অনেক সূরার নামকরণ করা হয়েছে নবী-রাসূলদের নাম দিয়ে। তন্মধ্যে সূরা ইউসুফ, ইবরাহীম এবং সূরা ইউনুস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যারা নবী ছিলেন না, কিন্তু স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের আলোচনাও পবিত্র কুরআনে উঠে এসেছে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে। আসহাবে কাহাফের বিস্তারিত ঘটনা, হযরত লোকমান, খিযির এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা এর স্বপক্ষে জ্বলন্ত প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্মপদ্ধতি ও বাণীর মধ্যেও এই উম্মাহর বিশেষ ব্যক্তিদের গুরুত্ব ফুটে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেখানেই নিজের অনুসরণের কথা বলেছেন, সাথে সাথে খোলাফায়ে রাশেদার অনুসরণের কথাও বলেছেন সমান গুরুত্বের সাথে। বর্ণিত হয়েছে,

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে খুব শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। (মিশকাত শরীফ ৩০)

এভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তারা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এক দল ছাড়া সবাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেই নাজাতপ্রাপ্ত জান্নাতি দলটির আলামত হচ্ছে তারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم

আমার সাহাবীরা তারকা সাদৃশ্য। যেকোনো একজনের অনুসরণ করলেই তুমি পেয়ে যাবে সঠিক পথের দিশা। (মিশকাত শরীফ ৫৫৪)

দ্বীনে মুহাম্মদীতে রিজালুল্লাহর সম্মান বেশি হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমনের মাধ্যমে নবুওয়াতের দরজা চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার এই দ্বীনের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। অর্থাৎ এই দ্বীন কোনো ভূখণ্ড, কিংবা কোনো অঞ্চল কিংবা কোনো যুগের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এই দ্বীন কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানব সন্তানের জন্য। সাথে সাথে পৃথিবীতে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্যনতুন সমস্যা। এর সমাধান আসমান থেকে আসার পথ তো রুদ্ধ হয়ে গেছে মুহাম্মদ আরবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে। তাহলে এর সমাধান আসবে কোথা থেকে? এর সহজ উত্তর হচ্ছে, নবুওয়াতের যে গুরু দায়িত্ব, উম্মাহকে সামনে নিয়ে যাওয়ার যে চ্যালেঞ্জ, তা অর্পিত হয়েছে রিজালুল্লাহ তথা এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ জমাআত উলামায়ে কেরামের পবিত্র স্কন্ধে। হাদীস শরীফে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে–

العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثو دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔

উলামায়ে কেরাম নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীরা তো কোনো ধন- সম্পদ ছেড়ে যাননি বরং তাঁরা ইলমের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। যে ইলমের কোনো অংশ পেল বস্তুত সে অনেক বড় অংশই পেল। (মেশকাত শরীফ ৩৪)

হাদীস শরীফে এ বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে যে,

যখন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান আলেমরা এক এক করে পরপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবেন, তখন এই উম্মাহর হাল কী হবে এবং কিভাবে উম্মত ধীরে ধীরে পথভ্রষ্টতার দিকে ঝুঁকে পড়বে? হাদীস শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে–

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا لم يبق عالم اتخذا لناس رووسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔

আল্লাহ তা'আলা এই ইলমকে বান্দাদের অন্তর থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে বিলুপ্ত করবেন না। বরং প্রথিতযশা আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। যখন সত্যিকার আলেম আর অবশিষ্ট থাকবে না, লোকেরা অজ্ঞদেরকে নিজেদের সর্দার এবং দলপতি বানিয়ে নেবে। তাদেরকে শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা শরীয়তের কোনো জ্ঞান ছাড়াই মানুষদেরকে সমাধান দিয়ে দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং তাদের অনুসারীদেরকেও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার গলিতে নিক্ষেপ করবে। (মেশকাত শরীফ)

উপরোক্ত হাদীসে পরোক্ষভাবে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উলামায়ে কেরামকে তাদের জীবদ্দশায় সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের মূল্যায়নে যেন সামান্য অবহেলাও না হয় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে দ্বীন সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন অত্যন্ত সুচারুরূপে।

সাহাবীদের স্বর্ণালি যুগে সমস্ত সাহাবী জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতায় সমপর্যায়ের ছিলেন না। কিছু সাহাবীর কাছে লোকেরা শরীয়তের বিধিবিধান জিজ্ঞেস করত। তদ্রূপ তাবেঈন, তাবে'তাবেঈন এবং ফুকাহাদের যুগেও সবাই জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সমান পারদর্শী ছিলেন না। তখনকার যুগেও লোকেরা শরীয়তের বিধিবিধান জানার জন্য আলেমদের কাছেই আসত। "ইসলামী ফিকহ"-এর আকৃতিতে উলামায়ে কেরাম যে অবিস্মরণীয় কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন, তা কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে জাজ্বল্যমান থাকবে।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন নতুন ফিতনা এবং বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার ঘটনা নতুন কিছু নয়। ইসলামের আজন্ম শত্রুরা বিভিন্ন কূটচাল এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের এই দেদীপ্যমান প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছে বহুবার। কিন্তু উলামায়ে কেরাম সব ফিতনাকে প্রতিহত করেছেন শক্তভাবে এবং উম্মাহের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যেরও সংরক্ষণ করেছেন। হিন্দুস্তানের কথাই ধরুন। স্বাধীনতার সময় এখানকার অবস্থা কত নাজুক ছিল? মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করার জন্য সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টাই করা হয়েছে। উলামায়ে কেরামের কর্মতৎপরতার সামনে সব নীল নকশাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হয়েছে। একটু ভাবুন তো! হিন্দুস্তানে যদি দেওবন্দী উলামাদের এই মুবারক জামা'আত না হতো আজ আমাদের অবস্থা কী হতো? নামাযের জন্য ইমাম পাওয়া যেত না, আন্দোলনের প্রাণশক্তি ও পুরোধার তীব্র সংকট হতো, চারদিকে ভ্রান্ত মতবাদের জয়জয়কার শোনা যেত, ইসলামী সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচারের মূলোৎপাটন করা হতো। দেওবন্দী উলামাদের পবিত্র এই জামাআত হাজারো বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে, শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে এবং নানা প্রতিকূলতার মাঝেও দ্বীনের এই মশালকে প্রজ্বলিত রেখেছেন।

উম্মতে মুহাম্মদী এমন এক জামাআত, যারা সদা সর্বদা উলামায়ে কেরামের প্রতি মুখাপেক্ষী। কেননা, আলেমরা হচেছ ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহক। কেউ যদি নিজের জীবনকে ইসলামের রঙে রঙিন করতে চায় তাহলে কদমে কদমে তার ইলমের প্রয়োজন পড়বে। একজন নামাযীর কথাই ভাবুন। সঠিকভাবে নামায পড়তে চাইলে আপনাকে অজস্র মাসায়েল জানতে হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আপনি নিত্যনতুন সমস্যার সম্মুখীন হবেন। লেনদেন, সামাজিক আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, শিষ্টাচারসহ জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা কী? তা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। চিন্তা করুন, মসজিদ সম্মানিত এই কারণেই যেহেতু নামাযের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সেখানে সম্পাদন করা হয়। কাবা শরীফ এ কারণে সম্মানিত, যেহেতু তা আল্লাহর পবিত্র ঘর, মুসলমানদের কেবলা এবং হজ্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তার সাথে সম্পৃক্ত। রোযার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় রমজান মাস এত মাহাত্ম্যপূর্ণ। একটু গভীরভাবে ভাবুন তো, উল্লিখিত বস্তুসমূহ এক-একটি ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় কত সম্মানিত হয়েছে। অথচ উলামায়ে

কেরামের সম্পর্ক সমস্ত ইবাদত এবং দ্বীনের প্রতিটি অংশের ওপর ব্যাপৃত। তাহলে উলামায়ে কেরাম সম্মানের কত উচ্চাসনে সমাসীন হবেন, ধারণা করতে পারেন।

সাম্প্রতিক কালে সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের অন্তরে হক্কানী উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাঁদের সম্পর্কে নানা কুৎসা ও মিথ্যা অপবাদ রটানো হচ্ছে। ইসলামের শত্রুরা দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, মুসলমানদের চালিকাশক্তি ও প্রাণশক্তি হচ্ছে, এই উলামায়ে কেরাম। তাঁদের কল্যাণে মুসলমানরা এখনও ঈমানী বলে বলীয়ান। তাই তাদের দৃষ্টি এখন এদিকে নিবদ্ধ যেন জনসাধারণ উলামায়ে কেরামে সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে এবং উলামাদের সাথে তাঁদের শিকড় ও নাড়ির সম্পর্ক যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই পুরো বিশ্বে এখন আন্তর্জাতিকভাবে উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে অপবাদ রটানো হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও এই অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার হীন স্বার্থে আহলে কুরআন এবং আহলে হাদীসের চিত্তাকর্ষক মোড়কের লেভেল দেওয়া হচ্ছে। উলামা ও ফুকাহা সম্পর্কে এই অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তাঁরা কুরআন-হাদীস থেকে দূরে ছিলেন। তাঁদের কাজকর্মে কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা প্রতিফলিত হয়। আল্লাহ না করুন! যদি এই ঈমান-বিধ্বংসী দৃষ্টিভঙ্গির বিষবাষ্প চারদিকে আপন ডালপালা বিস্তার করে, তাহলে ভবিষ্যতে এই উম্মতকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই ইসলামের আলোকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, সেখানে শত্রুদের কর্মপদ্ধতি কী ছিল, তা নিয়ে আপনি গবেষণা করুন। তারা সর্বপ্রথম জনসাধারণকে উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তুলত। এরপর মুসলমানরা নিজেদের মূল্যবান ঈমান খুয়ে বসত শত্রুদের হাতে।

রাশিয়ায় শত্রুরা সর্বপ্রথম সাধারণ মুসলমান ও আলেম সমাজের মাঝে দূরত্ব ও ফাটল সৃষ্টি করে। এরপর এক এক করে ধ্বংস করে ইসলামের সুমহান নিদর্শনাবলি।

আমরা এই দাবি করছি না, আলেম সমাজ সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পূতঃপবিত্র। কারণ তারাও সকলের মতো মানবসমাজেরই অংশ। তাদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। কিন্তু দু-একটি ভুলের জন্য পুরো আলেম সমাজকে হেয়প্রতিপন্ন করা, তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা কতটা বুদ্ধিমানের কাজ?

লোকেরা ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে। ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নেয়। এভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে। কিন্তু কখনও এ ধরনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি যে, কোনো ইঞ্জিনিয়ারের ব্যক্তিগত দোষের কারণে সকল ইঞ্জিনিয়ারকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। সেরূপ ডাক্তারও।

তবে এটাও স্বীকার করতে হবে একজন আলেমের দায়িত্ব ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নীতি-নৈতিকতা এবং চরিত্রের সর্বোচ্চ আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত হতে হয়। কিন্তু যা হোক তিনিও একজন মানুষ। তিনিও কখনও ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নন। তাই বলে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেভাবে পুরো আলেম সমাজকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে 'যেমন বর্তমানে তা অনেকের স্বভাবে পরিণত হয়েছে', যা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

ইলমে দ্বীন এবং উলামায়ে কেরামের অসম্মান এবং অবমাননার বিভিন্ন নিত্যনতুন কৌশল পরিলক্ষিত হচ্ছে। মসজিদের ইমাম এবং মুআযযিনদের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় মাসলা মাসায়েল বলতে দেওয়া হয় না। কোনো মসজিদের ইমাম হওয়ার অর্থই হচ্ছে সে পুরো মহল্লাবাসীর তীর্যকবাণে জর্জরিত হবে। ইমামদের কোনো ধরনের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে তার ধারণাও নেই অনেকের কাছে। মসজিদ কমিটির সদস্য এবং মুতাওয়াল্লীরা ইমাম-মুআযযিনদের সাথে অনেক সময় চাকরদের মতোই আচরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাদেরকে বার বার চাকরিচ্যুত করার ধমকি দেওয়া হয়। কমিটির প্রতিটি সদস্যই চায় ইমাম যেন তার অনুগত থাকে। কমিটির সদস্যদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের মাসুল দিতে হয় ইমামদেরকে।

মাদরাসার জিম্মাদারদের চরিত্রে খুঁত বের করা, তাদের সম্পর্কে বানোয়াট অপবাদ রটানো বর্তমানে নিন্দুকদের অন্যতম 'প্রিয় অভ্যাসে' পরিণত হয়েছে। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে মুহতামিমকে কোন ধরনের ঝড়-ঝাপটার সম্মুখীন হতে হয়, তা রয়ে যায় সবার অগোচরে। কিন্তু যখন মাদরাসায় সুরম্য প্রাসাদ ও বিশাল

বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হয়, তখন সবার মনে উদিত হয় হাজার হাজার প্রশ্ন। সমালোচনার তীরে ঝাঁঝরা হয়ে যায় মুহতামিম সাহেবের পুরো দেহ-মন।

তবে অস্বীকার করা হচ্ছে না অনেকেই আলেম উলামার পবিত্র বেশভূষা ধারণ করে মুসলমানদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে। এ ধরনের অর্বাচীনদের এই অসৎ কাজকে তো সমর্থন দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এ ধরনের কয়েকটি হাতে গোনা বিচ্ছিন্ন ঘটনার অজুহাতে সমস্ত মাদরাসার ওপর কলঙ্কের তিলক এঁটে দেওয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

বর্তমানে ওই সব কুলাঙ্গারদের স্পর্ধা এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তারা যেন মৃতদেরকেও সামান্য ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়?

তদ্রূপ মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরকে অনেকে খুব নীচু দৃষ্টিতে দেখে বলে মনে হয়। তাদেরকে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক বলে বিবেচনা করে।

বর্তমানে ধর্মের ব্যানারে অনেকে আলেম-উলামাদের সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে। কোনো ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হতে না হতেই তারা আলেম-উলামা সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা শুরু করে। মাদরাসার সকল কাজকর্মকে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক মনে করে থাকে। এমনকি আলেম-উলামা সম্পর্কে বাজে মন্তব্য এবং অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

পূর্ববর্তী বড় বড় আকাবেরকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের নতুন নীল নকশা তৈরি করা হচ্ছে। উম্মাহর পূর্ববর্তী উলামা এবং ফুকাহাদের কীর্তি নিয়ে সমালোচনার ঝড় তোলা হচেছ। সাধারণ লোকদেরকে তাঁদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করা হচ্ছে।

বর্তমানে এই সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র আপন ডালপালা খুব দ্রুততার সাথে বিস্তার করা আরম্ভ করেছে। সাধারণ মুসলমানের অন্তর থেকে আলেম-উলামার সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্ব নিঃশেষ করা ইসলামের শত্রুদের একটি মৌলিক লক্ষ্য। এই ষড়যন্ত্রকে যত ত্বরিত নস্যাৎ করা যায়, ততই উম্মাহর জন্য মঙ্গল।

এই সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সকলের সতর্ক থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ

মুহাম্মদ হাসান জামিল
টঙ্গিবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমি বিভিন্ন মৌসুমে ফলের বাগান করে থাকি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, বর্তমানে মানুষের মৌসুমি ফল খাওয়ার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ফরমালিন ব্যবহার করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফরমালিন ব্যবহার না করলে ফল নষ্ট হয়। কালার হয় না, তখন তা কেউ ক্রয় করতে চায় না। ফরমালিন ব্যবহার করলে সুন্দর কালার হয়। দেখতে ভালো দেখায়। শরীয়তের আলোকে এর হুকুম কী হবে?

সমাধান :

শরীয়তের আলোকে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এমন সব বস্তু খাওয়া বা ব্যবহার করা নিষেধ। আর ফরমালিন ডাক্তারি পরীক্ষা মতে বিষাক্ত উপকরণ। অপব্যবহারের প্রেক্ষিতে যা ক্ষতিকারক পদার্থ হিসেবে বিবেচিত। ফরমালিনের কারণে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টির প্রবল আশঙ্কাও রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন বিধায় যেকোনো পণ্যে বা মৌসুমি ফলে ফরমালিন ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। (সূরা আরাফ ১৫৭, তাফসীরে কবীর ৭/২৭, মেশকাত ১/২৪৯, আল-আশবাহ ওয়াননাযায়ের ১৭৩, কাওয়ায়েদুল ফিকহ ৮১)

প্রসঙ্গ : বাগান বিক্রি

জিজ্ঞাসা : ২.

বিভিন্ন জায়গায় তিন বা চার বছর চুক্তিতে বাগান ক্রয় করা হয়। আমি শুনেছি ফল না দেখে বাগান ক্রয় করা বৈধ নয়। বর্তমানে দেখি সবাই পাতে বা চার-পাঁচ বছর চুক্তিতে বাগান ক্রয় করে। এ পন্থায় বাগান ক্রয় করা বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের আলোকে ফল ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বেচাকেনা জায়েয নেই। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে চার-পাঁচ বছরের জন্য ফলের বাগান ক্রয় করা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয ও নিষেধ বলে বিবেচিত হবে। (রাদ্দুল মুহতার ৬/৮, ৬/৫৩, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া ১৫/১২২, ফতাওয়ায়ে উসমানিয়া ৩/৩৭৯)

প্রসঙ্গ : ছবি

মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
শ্যামলী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি মাছ-মুরগির খাদ্য কোম্পানির ডিজাইন অনুযায়ী মাছ বা মুরগির ছবিসহ ব্যাগ প্রিন্ট করে সরবরাহ করে থাকি। জানার বিষয় হলো, উক্ত ছবি প্রিন্ট করা বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

ইসলামী শরীয়তে উপায়হীন প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রাণীর ছবি তোলা সম্পূর্ণ হারাম তথা কবিরা গোনাহ। চাই তা হাতে আঁকা, ক্যামেরায় তোলা, মাটি ইত্যাদি দিয়ে বানানো কিংবা প্রিন্ট করা হোক। সব ধরনের প্রাণীর ছবির একই হুকুম। তথা নিষেধ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মাছ-মুরগির খাদ্যের বস্তায় ছবি প্রিন্ট করা বৈধ হবে না। তা থেকে বিরত থাকা জরুরি। (সহীহে বুখারী ২/৮৮০, রদ্দুল মুহতার ১/৬৪৭, বাদায়েউস সানায়ে ১/১১৬)

প্রসঙ্গ : কাফন-দাফন

হাফেজ সাইফুল্লাহ
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : ১.

লাশ কবরে রেখে কাফনের বাঁধন খুলে দেওয়া হলে সাধারণত কাপড় ফাঁকা হয়ে শরীর বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হয়। তাই কাফনের উপরের চাদরটি বড় করে নিয়ে এক পেঁচ দিয়ে পরানো যাবে কি না?

২. কেবলার দিক থেকে লাশ কবরে নামানোর পর পূর্ব দেয়ালে ঠেস দিয়ে ডান কাতে শোয়াতে গেলে লাশকে ডিঙিয়ে পশ্চিম পাশে আসতে হয়। এতে কোনো অসুবিধা আছে কি না? এবং মাথার নিচে মাটির চাকা বালিশের মতো করে দেয়া যাবে কি না?

৩. সুন্দুক কবর খননের সময় ভেতরের যে অংশে লাশ রাখা হবে

তার গভীরতা কতটুকু হতে হবে এবং ভেতরে কতটুকু ফাঁকা রাখতে হবে? অনেকে বলে বসার পরিমাণ ফাঁকা রাখতে হবে। কথাটি সঠিক কি না?

সমাধান : ১. চাদর ও ইযারের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, প্রস্থে এই পরিমাণ চওড়া হওয়া, যাতে মৃত ব্যক্তির শরীর বাঁধন ছাড়াই পরিপূর্ণভাবে ঢেকে যায়। এতদ সত্ত্বেও সুন্নত তরীকায় লাশ কবরে রেখে বাঁধন খুলে দেওয়ার পর শরীর বের হওয়ার উপক্রম হলে বাঁধন না খোলারও অনুমতি আছে। বিধায় উপরের চাদরটি বড় করে নিয়ে পেঁচ দেওয়া নিয়ম পরিপন্থী। (রদ্দুল মুহতার ২/২০২, সুনানে আবী দাউদ ২/৪৪৯, ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৫/২৫৯, উমদাতুল ফিকহ ২/৫৩১)

২. জীবিত ব্যক্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আদব বজায় রাখা জরুরি। তাই সর্বাবস্থায় লাশ ডিঙিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে কবর লাশের চেয়ে লম্বা করে খনন করবে, যাতে উভয় পাশ দিয়ে বের হওয়া যায় বা অন্যের সাহায্য নেবে। অথবা লাশকে পূর্ব দেয়ালে ঠেস না দিয়ে পিঠে কাঁচা ইট বা মাটির চাকা দিয়ে ঠেস দিয়ে কেবলামুখী করে শায়িত করবে। আর মাথার নিচে বালিশের মতো কাঁচা মাটি রাখার কোনো শরয়ী বিধান নেই। (রাদ্দুল মুহতার ৫/৫৮, আল মাদখাল ৩/২৬০, এমদাদুল আহকাম ১/৮৩৯)

৩. বসার পরিমাণ ফাঁকা রাখা আবশ্যক নয়। সুন্দুক কবরের ক্ষেত্রে ভেতরের গর্তের চেয়ে প্রথম গর্তটি গভীর রাখতে হবে, যাতে বেশি করে মাটি ভরা যায়। ভেতরের অংশটি এতটুকু গর্ত করতে হবে, যাতে বাঁশ লাশের কাছাকাছি বিছানো সম্ভব হয় এবং একেবারে শরীরকে স্পর্শ না করে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৮২, এমদাদুল আহকাম ১/৮৩৮, আহসানুল ফতাওয়া ৪/২৫২)

প্রসঙ্গ : মৃত্যুদিবস পালন

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম
ছোলমাইদ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

কোনো মানুষ যদি মারা যায় তার মৃত্যুদিবস পালন করা শরীয়তসম্মত কি না।

সমাধান :

ইসলামের স্বর্ণযুগে জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বিধায় কারো মৃত্যুদিবস পালন করা শরীয়তসম্মত নয়। (তাফসীরে মাযহারী ২/৬৫, রাদ্দুল মুহতার ২/২৪১, ফতাওয়ায়ে লৌখনভী ৯০, ফতাওয়ায়ে উসমানি ১/১০৮)

প্রসঙ্গ : ওয়াকফ

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক মহিলা তার নিজ জমি থেকে সাড়ে বিশ শতাংশ জমি কওমী মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করেন। কিন্তু জমি দলিল করার সময় তার অজান্তে বা জানা অবস্থায় তার ছেলেরা দলিলের এক পাতায় এ কথা লিখেন যে, যদি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কোনো সময় দাতার সাথে কোনো ধরনের খারাপ আচরণ করেন তাহলে উক্ত জামি ফেরত নেওয়া হবে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, দলিলে উক্ত কথা লিখার দ্বারা ওয়াকফ সহীহ হয়েছে কি না?

খ. উক্ত জমি মাদরাসার জন্য আলাদা করে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু দাতার ছেলেরা বলেন আমরা উক্ত জমির পরিবর্তে অন্য জমি দেব। বা তার সমপরিমাণ মূল্য দেব। এখন জানার বিষয় হলো, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ অন্য জমি বা মূল্য নিতে পারবে কি না?

গ. এমতাবস্থায় যদি উক্ত জমি ওয়াকফ হয়ে থাকে। আর দাতা বা তার ছেলেরা সেখানে জোরপূর্বক মাদরাসা করতে না দেয় তাহলে তাদের শাস্তি বা গুনাহর কথা শরীয়তে কী বলা হয়েছে?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত মহিলা কর্তৃক মাদরাসার নামে মৌখিকভাবে ওয়াকফ করার দ্বারাই ওয়াকফ সহীহ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ওয়াকফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে আল্লাহর মালিকানায় চলে গেছে। তাই এর মধ্যে কোনো প্রকারের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও শর্তারোপ করা বৈধ হবে না। বিধায় দাতার ছেলেদের জন্য কোনো ধরনের শর্তারোপ করা, ওয়াকফকৃত জমির পরিবর্তে অন্য জমি বা তার মূল্য দেওয়ার প্রস্তাব এবং উক্ত জায়গায় মাদরাসা করতে না দেওয়া কোনোটাই বৈধ হবে না। মাদরাসা করতে বাধা দিলে মাদরাসার হক ধ্বংস করার গোনাহ হবে। (রাদ্দুল মুহতার ৪/৩৩৮, ফতাওয়ায়ে আলমগীরী ২/৩৫৭, ফতাওয়ায়ে কাজী খান ৪/৩০৬, ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ১৩/১৭৭)

প্রসঙ্গ : মাহফিলের গরু বিক্রি

হাফেজ রিদওয়ান
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

এক ব্যক্তি মাদরাসার মাহফিলে মেহমানদের খাওয়ানোর জন্য একটি গরু দান করল। উক্ত গরুর গোশত মেহমানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তা রান্নার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে কি না?

সমাধান :

প্রয়োজনাতিরিক্ত গরুর গোশত দাতার সম্মতিতে অন্য খাতে ব্যবহার করা ও বিক্রি করা যাবে। (রাদ্দুল মুহতার ৪/৪৪৫, ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ১৪/১০৯)

প্রসঙ্গ : কাফন-দাফন

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : ১.

মহিলাদের দাফনের ক্ষেত্রে লাশের আকৃতি পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য কবরকে পর্দা দিয়ে ঘেরাও করা কেমন?

২. মৃতের বাড়িতে আগত মেহমানদের জন্য খাবার পাঠানোর বিধান কী? এবং তাদের জন্য ওই মুহূর্তে খাবার গ্রহণ কেমন?

৩. দাফন শেষে সকলে চলে যাওয়ার পর কবরের পাশে কতক্ষণ অবস্থান করার নিয়ম এবং কী আমল করতে হয়? অনেকে বলেন, পশু জবাই করে গোশত বানানো সময় পরিমাণ দু'আয় মশগুল থাকতে হয়। এই বিষয়সমূহে সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

সমাধান : ১.

মহিলাদের দাফনের ক্ষেত্রে লাশের আকৃতি পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য কবরকে পর্দা দিয়ে ঘেরাও করা মুস্তাহাব। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১২৫, রাদ্দুল মুহতার ২/২৩৬, বাদায়ে ২/৩৫৮)

২. মৃতের বাড়িতে তার পরিবারের জন্য খাবার পাঠানো মুস্তাহাব এবং তাদের জন্য ওই মুহূর্তে খাবার গ্রহণ করার ব্যাপারে শরয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই উক্ত খানা আগত মেহমানরাও খেতে পারবে। (সুনানে আবী দাউদ ২/৪৪৭, আদ্দুররুল মুখতার ১/১২৬, রাদ্দুল মুহতার ২/২৪০, ফতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৭/৮৪)

৩. দাফন শেষে কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করা তথা একটি পশু জবাই করে তার গোশত বণ্টন করার সময় পরিমাণ দু'আয় মশগুল থাকা। যেমন তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা এবং সূরায়ে বাকারার শুরু এবং শেষের দুই আয়াত ইত্যাদি পড়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (সুনানে আবী দাউদ ২/৪৫৯, মিশকাতুল মাসাবীহ ১৪৯, আদ্দুররুল মুখতার ১/১২৫, রাদ্দুল মুহতার ২/২৩৭, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৭২)

প্রসঙ্গ : মীরাস

মুহাম্মদ রেজওয়ানুর করীম
কল্যাণপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : আমার পিতা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সে হিসেবে তিনি সরকারিভাবে মাসিক সম্মানী পেতেন। তাঁর ইন্তিকালের পরও উক্ত মাসিক ভাতা জারি রয়েছে, যা আমার আম্মা পাচ্ছেন। আমার জানার বিষয় হলো, আব্বাজানের অন্যান্য সম্পদের ন্যায় মাসিক ভাতার ওপর মীরাসের হুকুম জারি হবে কি না?

সমাধান : ইসলামী শরীয়তে মৃত্যুকালীন সময়ে মরহুমের মালিকানাধীন সম্পদে মীরাসের বিধান রাখা হয়েছে। যেহেতু প্রশ্নে বর্ণিত সরকারি ভাতা মরহুমের মালিকানাধীন সম্পদ নয় বরং সরকারের পক্ষ থেকে একটি পুরুস্কার, যা আপনার পিতার মৃত্যুর পর বর্তমানে আপনার আম্মার জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দ, তাই এতে অন্যান্য ওয়ারেশীন অংশ পাবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৯/৩০১, ফতাওয়ায়ে রহীমিয়া ১০/৫২২)

প্রসঙ্গ : মহিলাদের জুমু'আ ও জামাআত

মসজিদ কমিটি
দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

মহিলাদের জন্য মসজিদের দোতলায় জামাআতে নামায পড়ার ব্যবস্থা করা শরীয়তসম্মত কি না?

সমাধান :

রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরুষদেরকে মসজিদে আসার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং ইচ্ছাকৃত না আসার দরুন রাগান্বিত হয়ে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নির্দেশ দেননি। বরং অধিক সওয়াবের আশায় মসজিদে আসতে দেখে তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মহিলাদের জন্য ঘরের অন্দর মহলে নামায পড়া মসজিদে পড়ার চেয়ে উত্তম। এমনকি বায়তুল্লাহ শরীফে এবং মসজিদে নববীতে অতি প্রয়োজন ব্যতীত নামায পড়ার চেয়েও

বাড়িতে নামায পড়া অধিক উত্তম ও বেশি সওয়াবের কাজ।

উপরন্তু মহিলারা জামাআতের সাথে নামায পড়ার জন্য নির্দেশিত নয়। তা সত্ত্বেও ঘর ছেড়ে মসজিদে আসার প্রত্যাশী হওয়ার পেছনে কী রহস্য লুকায়িত আছে, তা বোধগম্য নয়।

ইসলামের সোনালি যুগে স্বতন্ত্র মহিলা মসজিদের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মহিলারা কোনো প্রয়োজনে বের হওয়ার পর নামাযের সময় হয়ে গেলে এবং বাড়ি ফেরা পর্যন্ত নামায কাজা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে যেকোনো মসজিদের কোনায় সে একাকী নামায পড়াতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই।

তদুপরি মহিলাদের জন্য পৃথক মসজিদের ব্যবস্থা করা তাদেরকে মসজিদে আসার আহবান ও দাওয়াতের নামান্তর, যা অধুনা ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত করার পর্যায়ভুক্ত বৈ কিছু নয়। বিধায় এর অনুমতি কোনো খোদাভীরু আলেম দিতে পারেন না। (সহীহ বুখারী ১/১২০, এলাউস সুনান ৪/২৩০, তাবরানী, জামেউস সাগীর মাআ ফয়জুল কদীর ৪/২৩৩, শরহে এনায়া আলা হামেশ ফতহিল কাদীর ১/৩১৭, উমদাতুল কারী ৬/১৫৭, রাদ্দুল মুহতার ১/৫৬৬, আল-বাহরুর রায়েক ১/৬২৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৮৩, ফতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৩/৪৯, নাওয়াদেরুল ফিকহ ২৭০, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৪/২৩৯ ইত্যাদি)

প্রসঙ্গ : এনজিও

মুহাম্মদ নাজমুল হাসান
নুরের চালা, বারিধারা, বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি কিছুদিন আগে ব্র্যাকে চাকরিতে ঢুকে অফিস সহকারী পদে চাকরি করছি। আমার কাজ হলো ফটোকপি করা, বড় বয়দের পানি, চা, নাস্তা দেওয়া, ব্র্যাক স্কুলের ছোট ছোট বাচচাদের নাচ গান শেখানোর বাদ্যযন্ত্র, আর্ট, ছবি অংকন করা পোস্টার ইত্যাদি গাড়িতে তুলে দেওয়া। আমাদের লেভেলে যে পরিমাণ কাজ, সে হিসেবে বেতন নগণ্য। ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রজেক্ট হলো ব্র্যাক ফিশারিজ, পোলট্রি, ঋণদান কর্মসূচি, স্কুল, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, শীতবস্ত্র দান, মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চাকরির সুযোগ, বিভিন্ন মিছিল-মিটিং ইত্যাদি। এই সংস্থার চেয়ারম্যানসহ ৮০% কর্মকর্তা-কর্মচারী মুসলমান। এখন আমার জানার বিষয় হলো, এই চাকরি আমার জন্য শরীয়তের দিক থেকে কতটুকু প্রযোজ্য?

সমাধান :

প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় সরাসরি সুদি লেনদেন বা গুনাহের কাজে আপনি জড়িত না হলে অথবা সহযোগিতা না করলে আপনার জন্য উক্ত চাকরি বৈধ হলেও যেহেতু আমাদের দেশে প্রচলিত নন-ইসলামিক এনজিওগুলো সেবার আড়ালে বিভিন্ন ইসলাম-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে বিধায় পারতপক্ষে তাদের অধীনে চাকরি করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

আপনার কর্তব্য হবে, অন্য ভালো চাকরির ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্দেহমুক্ত হওয়া। (সূরায়ে মায়েদা ২, সুনানে আবী দাউদ ২/৪৭৩, কাওয়ায়েদুল ফিকহ ৮১, নেজামুল ফাতাওয়া ১/২২৫, জাওয়াহেরুল ফিকহ ২/৪৫৩)

এ'লান

দেশের কওমী মাদরাসাসমূহের পাঠাগারের জন্য প্রতিমাসে **'মাসিক আল-আবরার'-এর** সৌজন্য কপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'আল-আবরার পরিবার'।

যেসকল মাদরাসায় পাঠাগার রয়েছে তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ মোবাইল নাম্বারসহ ডাক ঠিকানা প্রেরণের।

আল্লাহর যে সকল বান্দাদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ মহৎ কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য এটিকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন এই দু'আ কামনা সকলের কাছে।

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩